গৌরাঙ্গলীলা প্রসঙ্গ

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল [illegible]৫৮

প্রকাশক

সমীরকুমার নাথ

নাথ পাবলিশিং

২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস

কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদ শিল্পী

গৌতম রায়

মুদ্রাকর

পি. কে. পাল

শ্রীসারদা প্রেস

৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০০০৯

শম্ভুদা,

আপনি বৈষ্ণব নন। তবু "যদি গৌর না হোত" রচনায় প্রমাণ করেছেন আপনি অবৈষ্ণব নন। গৌরাঙ্গলীলা প্রসঙ্গ তাই আপনাকেই উৎসর্গ করলাম।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

অবতরণিকা

ভক্তিযোগ শূন্য লোক দেখি দুঃখ পাই ॥

*   *   *

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাসুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যজ্ঞ পূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥

চৈঃ ভাঃ। আদি খণ্ড। ২য় অঃ।

কাল-প্রভাবে ভক্তিযোগ লুপ্ত হতে চলেছিল। সেই ভক্তিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবদ্বীপে, শান্তিপুরে। চারদিকে শুধু কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগান—

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ আরাধনা ॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তনের প্লাবন এসে ভাসিয়ে দিয়েছে চারদিক। শুষ্ক, মুমূর্ষু মানুষ যেন সঞ্জীবিত হয়েছে। হরির্নামৈব কেবলম্। কলিযুগের একমাত্র সাধনা, একমাত্র উপাসনা। এই উপাসনা, নাম প্রচারের শেষ বাধা অবিশ্বাস, উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতীক জগাই মাধাইও ভক্তিযোগে দীক্ষিত। গৌরাঙ্গদেব অনুভব করলেন—এবার গৌড়-ভূমির ঘরে ঘরে হরেনাম সঙ্কীর্তন প্রচারিত হবে। কৃষ্ণপ্রেমের ঢেউ এসে ভাসিয়ে দেবে। কিন্তু শুধু গৌড়ভূমির কথা ভাবলেই তো চলবে না। এই কৃষ্ণপ্রেমের ঢেউ বয়ে নিতে হবে দেশ-দেশান্তরে।

গৌড়ভূমে কৃষ্ণনাম প্রচারে রাজশক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্য বা সমর্থন আসেনি

বিন্দুমাত্র। তবে সাংঘাতিক বাধা বা সংঘর্ষের সম্মুখীনও হতে হয়নি। কিন্তু গৌড়-ভূমি সংলগ্ন উৎকলের রাজা পরম ধার্মিক। সেখানে প্রেমধর্ম প্রচারে বিঘ্ন না হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ করে নীলাচল, পবিত্র জগন্নাথ-ক্ষেত্র। এমন পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে কৃষ্ণপ্রেমের প্লাবন এসে ভাসিয়ে দিতে পারলে সমস্ত উৎকলভূমিই প্রেমধর্মে হাবুডুবু খাবে। দীক্ষিত হবে প্রেমধর্মে।

চব্বিশ বৎসর বয়সে মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী হয়ে তিনি খুব স্বল্পকালই নবদ্বীপে অবস্থান করেছিলেন। এর কারণ অবশ্য ছিল। সন্ন্যাসী হয়ে স্বস্থানে অবস্থান করলে কৃষ্ণনাম দেশ-বিদেশে প্রচার হবে কি করে? গৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত। সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হবার পূর্বে তিনি ছিলেন বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বেদ, উপনিষদ, ন্যায়শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন জ্ঞানী। দীক্ষা গ্রহণের পরই তিনি পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের পক্ষে ধর্মপ্রচার করবেনই বা কেমন করে? অথচ কৃষ্ণপ্রেমভক্ত রস আস্বাদনের পর সবাইকেই এই রস আস্বাদন করাতে চান। একদিন তাই গৌরাঙ্গদেব তাঁর পার্ষদগণের সামনে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন।

তোমা সভা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীবো।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিবো॥
সন্ন্যাসের ধর্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥ চৈঃ চঃ।

সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পর ভক্তগণ ভেবেছিলেন, গৌরাঙ্গদেব তাঁদের সঙ্গে নিয়ে অহর্নিশি সঙ্কীর্তনে মত্ত হয়ে থাকবেন। সমস্ত নদীয়া মাতোয়ারা করে তুলবেন তিনি। শচীমাতার মনে সাংঘাতিক মর্মপীড়া। প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ অল্পবয়সে সংসার-ধর্ম পালন না করে দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী হয়ে। আর তিনি ফিরে আসেননি। তাই গৌরাঙ্গকে সর্বক্ষণ কাছে রাখবার স্বপ্নই দেখতেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়েছে। সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ রাখা তো সম্ভব নয়। কাছে রাখলে লোকনিন্দা হবে। সন্ন্যাসধর্ম থেকে বিচ্যুত হবেন। পুত্রকে কাছে রাখার আনন্দের চাইতে ধর্ম হতে বিচ্যুত পুত্রকে জন্মস্থানে রাখার আত্মসুখের চিন্তার কথা তিনি যেন ভাবতেই পারছিলেন না। পুত্রের নিন্দা হবে, এ বড় মর্মান্তিক, দুঃখজনক। বাধ্য হয়েই তিনি

বলেছিলেন সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে—

তিঁহ যদি ইথা রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি, তবে মোর দুঃখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য হয়॥ চৈঃ চঃ।

সানন্দে মেনে নিলেন গৌরাঙ্গদেব। মনে প্রাণে এই আদেশই তো তিনি চেয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে। তাঁর অভিপ্রায়ের কথা মুখ ফুটে এমন করে বলতে পারেননি তিনি। অথচ উপায় নেই।

ভক্তি শূন্য সর্বদেশ না জানে কীর্তন।
কারো মুখে নাহি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ॥ চৈঃ ভাঃ।

দেশের এই সাংঘাতিক অবস্থায় কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তনই একমাত্র তপস্যা। এই কৃষ্ণনাম সুধা তিনি পান করে ব্যাকুল হয়েছেন। তাই আপামর জনসাধারণের জন্য এই অপরূপ সুধারসের ভাণ্ডার তুলে ধরতে চান। দেশে দেশে কৃষ্ণনাম প্রচার, বিরুদ্ধধর্মীদের স্বধর্মে নিয়ে আসার এমন দম্ভের কথা বৈষ্ণব হয়ে বলবেন কেমন করে? তাই তাঁর অন্তরের বাসনা মায়ের মুখ দিয়ে প্রকাশিত হওয়ায় আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। শচীমাতা বলেন—

নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ তাহা নিজ সুখ মানি॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

অবশ্য চৈতন্য ভাগবতে গৌরাঙ্গদেবের নীলাচল যাত্রার অভিপ্রায় সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

বাহু প্রকাশিয়া প্রভু নিজ কুতূহলে।
বলিলেন—আমি চলিলাঙ্ নীলাচলে॥
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে॥ চৈঃ ভাঃ। অন্ত খণ্ড।

কবি কর্ণপুরের রচিত কৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যের একাদশ সর্গে গৌরাঙ্গদেবের নীলাচল গমনের কথা লেখা রয়েছে। গোবিন্দদাসের কড়চায় নীলাচল যাত্রা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

নীলাচল যাত্রা স্থির হবার পর গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপবাসীদের অনুরোধ করেছিলেন—

ঘর যাঞা কর সদা কৃষ্ণ সঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ আরাধন॥ চৈঃ চঃ।

নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের কাছে অনুরোধ করবার পর মায়ের কাছে গিয়ে আদেশ চাইলেন—

আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিব গমন।
মধ্যে মধ্যে আমি তোমায় দিব দরশন॥ চৈঃ চঃ।

আরো দশদিন অবস্থান করলেন নবদ্বীপে। যাত্রার দিন বিষাদময় পরিবেশ। ভক্তগণের মধ্যে ক্রন্দনের রোল। সমস্ত নবদ্বীপ যেন শোকে মুহ্যমান। সমস্ত নবদ্বীপ-বাসীই যেন গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে সঙ্গে যেতে চান নীলাচলে। গৌরাঙ্গদেব প্রবোধ দিলেন—তোমরা আমার সঙ্গে যাবে কেন বল? আমি তো তোমাদের মধ্যেই রয়েছি। নবদ্বীপে তোমাদের মাঝখানেই তো আমাকে রেখে গেলাম! কৃষ্ণকীর্তন করবে। কৃষ্ণকথা শোনাবে সবাইকে। ঘরে ঘরে করবে কৃষ্ণ-আরাধনা। এই সুন্দর গঙ্গার কূলে—নবদ্বীপ ভক্তের আশ্রম। এই আশ্রমের মাঝখানেই আশ্রয় নিয়ে আমি রয়েছি। আমি কৃষ্ণপ্রেমের কাঙ্গাল। তোমরা আমাকে ভালোবেসেছো। তোমরা কৃষ্ণকথা বল, কৃষ্ণকে ভালবেসেছো। তাই তো তোমরা আমার ভক্ত। তোমরাই

তো আমার সব। ভক্ত বই আমার ত্রিজগতে দ্বিতীয় কেউ নেই।

সর্ব বেদে পুরাণে আশ্রয় মোর চায়।
ভক্তের আশ্রয়ে মুক্তি থাঁকো সর্বদায় ॥
ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতামাতা বন্ধু পুত্র ভাই ॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্ত বল স্বভাব আমার ॥
তোমার সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সভা লাগি মোর সর্ব অবতার ॥
তিলার্ধেকো আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সভে সত্য জানাইয়া ॥ চৈঃ ভাঃ। অন্ত খণ্ড।

ভগবান সর্বক্ষেত্রেই আশ্রয় খুঁজে বেড়ান। সেই আশ্রয় ভক্তদের হৃদয়ের মাঝখানে। সেই আশ্রয়ের মাঝখানেই যত লীলা। ভগবান একাকী লীলা আস্বাদন করেন না। ভক্তদের আশ্রয়ে ভগবান স্বতন্ত্র হয়ে লীলা আস্বাদন করেন। ভগবানের যত লীলা, সবই ভক্তচিত্তে আনন্দ বিনোদনের জন্য। ভক্তচিত্ত ভগবানের সুখ চিন্তা ছাড়া আর কিছুই যেমন ভাবতে পারেন না, তেমনি ভগবানও ভক্ত-হৃদয়ের সুখকে একাত্ম করা ছাড়া আর কিছুই জানেন না। এই সুখ, এই অপার আনন্দই প্রেমরস আস্বাদন। এই রস আস্বাদনের জন্যই কৃষ্ণের লীলা। এই রস আস্বাদনের ভেতর দিয়েই ভক্ত ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করে একাত্ম হয়ে যান।

এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ।
সেই দ্বারে করিব ভক্তের প্রসাদ ॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

ভগবান রস-স্বরূপ। রসো বৈ সঃ। (শ্রুতি)। অর্থাৎ তিনি রস-স্বরূপ। সকল রসের আধার, সকল রসের মূল শ্রীভগবান। আনন্দ এই রসের অপরূপ বিলাস। রস আস্বাদনেই অপার আনন্দ। বিশ্বের মূলে এই আনন্দ, স্থিতিতে আনন্দ, লয়েও আনন্দ। এই আনন্দ বিশ্বের অণু-পরমাণুকে ভাবানুরূপ রঙে রাঙিয়ে দেয়। ঐতেরীয় উপনিষদে লেখা আছে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি।
শ্রুতি ৩।৬

নিখিল ভূতগ্রাম আনন্দ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। আনন্দে জীবিত থাকে, আবার আনন্দে প্রবেশ করে লীন হয়ে যায়। বিশ্বের আদি, মধ্য, অন্তে এই রস বর্তমান। এই রসের বিলাসে অর্থাৎ আনন্দেই বিশ্বের সৃষ্টি। রসের বিলাসের জন্যই রস-স্বরূপের কামনা জাগ্রত হয়ে ওঠে। তখন স্থির-অচঞ্চল রসসিন্ধু চঞ্চল হয়, বিক্ষুব্ধ হয়ে উত্তাল হয়ে যায়। রস-স্বরূপ ভগবান তখন বহু হতে চান। এই বিলাস বা বহু হবার আনন্দেই বিশ্বের সৃষ্টি। আপনা আপনিই বিলাস হয় না। আবার বহু হতে চাইলে শক্তির প্রয়োজন। রসের যে বিলাস বা আনন্দ—এই আনন্দ শক্তিকে নিয়েই সম্পাদিত হয়। অনন্ত শক্তিমান ভগবানের তিনটি শক্তির নাম—বহিরঙ্গা মায়া শক্তি, তটস্থা জীব শক্তি, অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি। এই স্বরূপ শক্তি সৎ-চিৎ ও আনন্দ-রূপে প্রকাশিত। শ্রুতি বলেন—শ্রীভগবানের পরিচয় সচ্চিদানন্দ।

ভগবানের এই স্বরূপ শক্তি—সৎ, চিৎ, আনন্দ শক্তি-সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী নামে পরিচিত। ভগবানের সদংশে যে-শক্তি—তার নাম সন্ধিনী। এই শক্তির বিলাসে ভগবান সর্বব্যাপী। চিৎ অর্থাৎ সংবিত শক্তির বিলাসে ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্ব অন্তর্যামী। আর আনন্দাংশে যে শক্তি তার নাম হ্লাদিনী। এই শক্তির বিলাসে ভগবান বিশ্বকে অনুরঞ্জন করেন। অপার আনন্দের সৃষ্টি করেন। সদংশে-স্থিতি বা অস্তিত্ব বোঝায়। বিশ্ব-চরাচরে তিনি আছেন। চিদংশে তিনি জ্ঞান-স্বরূপ—স্বপ্রকাশ। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি প্রকাশিত করেছেন। বিশ্বে একমাত্র তিনিই প্রকাশিত হতেছেন। আনন্দাংশে তিনি সর্ব প্রিয় হতে প্রিয়তম। বিশ্বের যাহা কিছু আনন্দ তাহাতেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। তাই এই বিশ্ব-চরাচরে তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তম আর কিছুই নেই। তিনিই একমাত্র আনন্দদাতা, সর্ব আনন্দের আধার।

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা ৪

চৈতন্য চরিতামৃতে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতাপিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এই সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম—প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

এই মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা। রাধা-কৃষ্ণের লীলা ভক্তদের নিয়ে ভগবানের লীলা। ভক্তহৃদয়ের মাঝখানে এই যে রস আস্বাদন চলেছে, এই নিরন্তর অনুভবই ভগবানের অপার অনুগ্রহের ফল। এই অনুগ্রহ লাভের নিরন্তর প্রচেষ্টাই কঠোর সাধনা। সাধনার অর্থ ধর্মাচরণ বা বেদ ধর্ম, যাগ যজ্ঞ, বৈদিক অনুষ্ঠান নয়। এই ধর্মাচরণের মধ্যে পারলৌকিক সুখের ইঙ্গিত রয়েছে। মায়িক জগতে এই সুখ অনিত্য। কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণসেবা আর এই সেবা-সুখের তুলনায় সবই তুচ্ছ। গৌরাঙ্গদেব তাই ভক্তদের বললেন—তোমরা কৃষ্ণ ভজনা কর। কৃষ্ণ ভজনার ভেতর দিয়েই আসবে কৃষ্ণ অনুরাগ। এই কৃষ্ণ অনুরাগের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম। এই প্রেম নির্মল প্রেম।

ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা

কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্যের কথা বললেন গৌরাঙ্গদেব। এ মাধুর্যের কথা বোঝা যায় না। মাধুর্যের কি অপরিসীম আকর্ষণ; যে আকর্ষণ আদি নরনারীকে চঞ্চল করে। শ্রবণে, দর্শনে আকর্ষণ করে, মন প্রাণ ভরে তোলে। দুর্নিবার তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা তৃপ্ত করে শান্তি আনতে পারে না। বরং নিরন্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কৃষ্ণ মাধুর্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥
শ্রবণে, দর্শনে, আকর্ষয়ে সর্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন॥
এ মাধুর্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥ চৈঃ চঃ।
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমিষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

যাত্রার সময় উপস্থিত। শচীমাতার দু চোখের জল আর বাধা মানে না। ভক্তগণও ক্রন্দন করেন। গৌরাঙ্গদেব প্রবোধ দেন সবাইকে—তোমরা নিজ নিজ গৃহে যাও। সেখানে কৃষ্ণ সঙ্কীর্তন করো।

গৌরাঙ্গদেব আশ্বাস দিলেন—আবার তোমাদের সঙ্গে মিলন হবে। তোমরাও নীলাচলে গিয়ে আমার সাক্ষাৎ পাবে। আমিও নীলাচল থেকে আসবো গঙ্গা দর্শনের আশায়। সবাই গৌরাঙ্গদেবের যাত্রাপথের সঙ্গী হতে চান। অবশেষে যাত্রাপথের সঙ্গী হলেন চারজন ভক্ত।

নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥
এই চারজন আচার্য ছিল প্রভু সনে।
জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণ॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

মায়ের চরণ বন্দনা করে গৌরাঙ্গদেব পথ থেকে বেরিয়ে পড়লেন, নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর আর মুকুন্দকে সঙ্গে করে। কিন্তু বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্য ভাগবতের অন্ত খণ্ডে লেখা আছে যে গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল গমনের সময় নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও গোবিন্দ এই সব ভক্তবৃন্দ সঙ্গী ছিলেন। দামোদরের নাম চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ করা নেই।

হেন মতে গৌরাঙ্গ সুন্দর নীলাচলে।
আইসেন চলিয়া আপন কুতুহলে॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ॥ চৈঃ ভাঃ।

নবদ্বীপ থেকে নীলাচল দীর্ঘ পথ। পথ আদৌ সহজসাধ্য নয়। এক দেশ থেকে অপর দেশে যাত্রা। গৌড় দেশ; সে দেশের নৃপতি হুসেন শাহ্। নীলাচল উৎকল দেশের অন্তর্গত তীর্থস্থান। উৎকল দেশের অধিপতি প্রতাপরুদ্রদেব। দুই রাজার সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না আদৌ। তাই গৌড় দেশ থেকে উৎকল দেশে প্রবেশ করবার সময় সীমান্ত দেশ অতিক্রম করা ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। চৈতন্য ভাগবতে সেই সব অসুবিধার কথা লেখা রয়েছে।

ভক্তগণ বোলে প্রভু যে তোমার ইচ্ছা।
কার শক্তি তাহা করিবার পারে মিছা॥
তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখন কেহো পথ নাহি রয়॥
দুই রাজায় হইয়াছে অনন্ত বিষাদ।
মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ॥ চৈঃ ভাঃ।

এই সাংঘাতিক অসুবিধার কথা, বিপদের আশঙ্কায় নিরুৎসাহ হলেন গৌরাঙ্গদেব তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী; কিসের ভয় তাঁর? সর্বোপরি তিনি যে জগন্নাথ দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। কোন বাধাই যে বাধা নয় তাঁর কাছে। তাঁকে নীলাচলে যেতে হবে, পথে পথে গ্রামে গ্রামে প্রেম বিলাতে হবে। কৃষ্ণপ্রেমের কথা শোনাবেন সবাইকে। সামনে যে তাঁর বিশাল কর্তব্য। সব বাধা-বিপত্তির উপশম অবশ্যই হবে। ভক্তগণকে আলিঙ্গন করে সবার চোখের জল মুছিয়ে গৌরাঙ্গদেব এগিয়ে চললেন।

চলিলেন প্রভু দক্ষিণাভূমি হৈয়া॥ চৈঃ ভাঃ।

---

১. চৈতন্যদেব কেন নবদ্বীপ ত্যাগ করে নীলাচলে অবস্থান করেছিলেন—সে সম্পর্কে সংগত বক্তব্য থাকলেও ধর্ম প্রচার যে অন্যতম উদ্দেশ্য—সে ইঙ্গিত রয়েছে। কবি কর্ণপুর রচিত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক রচিত হয়েছিল ১৫৭২

সনে। চৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় ৩৯ বৎসর পরের রচনা। কবি কর্ণপুর চৈতন্যদেবের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। যদিও তিনি খুবই কম বয়স্ক বালক, তবু চৈতন্যদেবের প্রভাব তাঁর মনে পড়েছিল। তাঁর পিতা শিবানন্দ সেনকে চৈতন্যদেব অতিশয় স্নেহ করতেন। চৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থান কালে প্রতি বৎসরই রথযাত্রার সময় গৌড়ের ভক্তজন সহ শিবানন্দ সেন পুরীতে আসতেন। শিবানন্দ সেনের তিন পুত্র। তিনি সস্ত্রীক ও তিন পুত্র সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন।

শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞি মিলাইলা।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সভায় বহু কৃপা কৈলা॥
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছাইলা।
পরমানন্দ দাস নাম সেন জানাইলা॥
* * *
শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইলা।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা॥ চৈঃ চঃ।

সেই সময় পরমানন্দের বয়স সাত বৎসর। চৈতন্যদেব তাঁকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে বলায় পরমানন্দ কিছুতেই কৃষ্ণনাম করলেন না। কিন্তু একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে শোনালেন। সেই শ্লোকে গোপীগণের কর্ণভূষণ বর্ণনা করলেন, কৃষ্ণের জয়গান করলেন। চৈতন্যদেব সন্তুষ্ট হয়ে পরমানন্দকে কবি কর্ণপুর নাম দিয়েছিলেন।

চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের দশটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কের পরিচয়—স্বানন্দাবেশ।

উৎকলপতি প্রতাপরুদ্রদেব চৈতন্যদেবের তিরোধানের জন্য বিষণ্ণ হয়ে রথযাত্রার সময় এই নাটক অভিনয়ের নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এই অঙ্কেই সূত্রধারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—অচিন্ত্য প্রভু এই মহাপুরুষ কি নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েছিলেন? সূত্রধার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন—অদ্বৈতবাদীগণের মত খণ্ডনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণই সবিশেষ ব্রহ্ম। নাম সঙ্কীর্তন সহ ভক্তি যোগ তাঁহার অদ্বিতীয় সাধনা, জগতে প্রচার করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

২. গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পর নীলাচল যাত্রাকালে সঙ্গী ছিলেন—

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ দত্ত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্য চরিতামৃতে এই তথ্যই লেখা আছে। অবশ্য চারজন আচার্য গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গী ছিলেন। চারজন আচার্য ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন কিনা—কবিরাজ গোস্বামী নীরব। অবশ্য আচার্য চারজন সঙ্গী থাকলেও সাধারণ সঙ্গী থাকা অসম্ভব নয়।

বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্য ভাগবতে দেখা যায়—গৌরাঙ্গদেবের যাত্রাসঙ্গী ছিলেন—নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেমন গোবিন্দ, গদাধর ও ব্রহ্মানন্দের নাম উল্লেখ করেননি। বৃন্দাবন দাস অবশ্য দামোদরের নাম উল্লেখ করেননি তাঁর গ্রন্থে। অথচ কবিরাজ গোস্বামী শান্তিপুর থেকে গৌরাঙ্গদেবের নীলাচল যাত্রা খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখেছেন। সে প্রসঙ্গে বলা যায়—

চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছে দাস বৃন্দাবন॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

কবিরাজ গোস্বামী গৌরাঙ্গদেবের নীলাচল ভ্রমণ সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন সবই বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্য ভাগবত অনুসরণ করে। হয়তো সংক্ষিপ্ত করবার জন্যই কবিরাজ গোস্বামী সবার নাম উল্লেখ করেননি। শুধুমাত্র প্রধান আচার্যদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এ সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামীর রচনায় লেখা আছে—

নীলাদ্রি গমন জগন্নাথ দরশন।
সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুর মিলন॥
এই সব লীলা শ্রীবাস বৃন্দাবন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন উত্তম বর্ণন॥

* * *

চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন॥
তার সূত্রে আছে তিহোঁ না কৈল বর্ণন।
যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

৩. কবি কর্ণপুর রচিত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে লেখা আছে চৈতন্যদেব তাঁর মাতৃদেবী, অদ্বৈতাচার্য ও ভক্তবৃন্দদের বলেছেন যে—তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের পর জন্মস্থানের নিকটে আত্মীয়বর্গের সঙ্গে অবস্থান করা বিধেয় নয়। তাই তিনি—দেশত্যাগের জন্য মত ভিক্ষা করেন। চৈতন্যদেবের ভক্তবৃন্দ তাঁর নবদ্বীপ ত্যাগে সম্মত হন না। কিন্তু শচীদেবী বলেন—হে মহোদয়গণ, যদি বিশ্বম্ভর আমাদের কাছেই থাকার জন্য ধর্মহানি হয়, তবে কেবল আমাদের সুখের জন্য তাঁর অবস্থান সম্পর্কে আগ্রহ করা উচিত হবে না। খল ব্যক্তিরা যাতে তাঁর নিন্দা না করে, সেই কাজ করাই বিধেয়। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হবে। তাই জগন্নাথ ক্ষেত্রে যদি বিশ্বম্ভর অবস্থান করে, তাহলেই সর্বাংশে উত্তম হবে। কারণ, লোক গতায়াত সংবাদ পাবার আশা থাকবে।

চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে ৬ষ্ঠ অঙ্কে লেখা আছে—

রত্নাকর গঙ্গাদেবীকে বলছেন—গৌড়াধিপতি যবন রাজার ইদানীং প্রতাপরুদ্র-দেবের সঙ্গে বিরোধ থাকায় কারো গমনাগমন সম্ভব হোত না। অথচ কিরূপে চারটি পরিজনসহ ভগবান গমন করলেন?

গঙ্গাদেবী বলছেন—আর্যপুত্র, এ আশ্চর্যের বিষয় নয়। তিনি অন্তর্যামী ও জগতের অকৃত্রিম বন্ধু, জগতে যার দ্বেষ্য কেহই নয়, তার প্রতি কে বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করবে? ঐ দেখ, নৃপতিগণের উভয় পক্ষীয় ভয়ঙ্কর সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে অনায়াসে পাঁচ-ছয়জন বন্ধুগণের সঙ্গে গমন করলেন!

নাটকের বক্তব্য অনুসারে বোঝা যায়—চৈতন্যদেবের যাত্রাসঙ্গী পাঁচ-ছয়জন ছিলেন। তাঁদের নাম অবশ্য উল্লেখ করা হয়নি নাটকে।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পর ১৫১০ সনে শান্তিপুর থেকে নীলাচল গিয়েছিলেন। আবার ১৫১৪ সনে নীলাচল থেকে যাত্রা করে পৌছেছিলেন শান্তিপুর। শান্তিপুর থেকে আবার সম্ভবতঃ সেই বৎসরই নীলাচলে গিয়েছিলেন। সুতরাং চৈতন্যদেব দ্বিতীয়বার শান্তিপুর থেকে নীলাচলে কোন্ পথ অনুসরণ করে গিয়েছিলেন…সে পথের বর্ণনা পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সহজ-সাধ্য ও সংক্ষিপ্ত পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছিলেন তিনি। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃতে এই যাত্রাপথের উল্লেখ নেই। অবশ্য এই ভ্রমণ-পঞ্জীকে তেমন উল্লেযোগ্য মনে করেননি চৈতন্য-চরিতকারগণ।

শান্তিপুর থেকে নীলাচল যাত্রাপথের কথা লেখা রয়েছে গোবিন্দদাসের কড়চায়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেবের শান্তিপুরে অদ্বৈতার্যের গৃহে আগমন

ও আচার্যগৃহে অবস্থান সম্পর্কে লেখা রয়েছে কড়চায়। অবশ্য নবদ্বীপ থেকে শচীমাতার শান্তিপুরে আগমন, অদ্বৈতালয়ে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সবই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সংসারত্যাগী পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ, কথোপকথন, পুত্রের অসামান্য মাতৃভক্তি এসব কথা লেখা নেই কড়চায়। গোবিন্দ দাসের কড়চায় লেখা আছে—

কিছুকাল আচার্যর গৃহেতে রহিয়া।
তার মধ্যে শচীমাতা আসি দেখা দিলা॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু মাতার চরণে।
প্রণাম করিয়া কথা কন সন্তর্পণে॥
দুই চারি বাত কহি মায়া কাটাইয়া।
দক্ষিণে করিলা যাত্রা সকলে ছাড়িয়া॥

গোবিন্দ দাসের কড়চায় চৈতন্যদেবের শান্তিপুর থেকে নীলাচল আগমনের সময় ভাগীরথীর ধারার পশ্চিম দিক দিয়ে যাবার উল্লেখ রয়েছে। তাঁর যাত্রা-সঙ্গীদের মধ্যে নামের উল্লেখ করা হয়েছে—ঈশান, প্রতাপ, গঙ্গাদাস, গদাধর, বানেশ্বর ও গোবিন্দ।

শান্তিপুর থেকে নীলাচল যাত্রা সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস ও কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—গৌরাঙ্গদেব ভাগীরথীর পূর্বকূল অনুসরণ করে পদযাত্রা শুরু করে-ছিলেন।

নীলাচলে

পদযাত্রা শুরু করলেন গৌরাঙ্গদেব। শান্তিপুর হতে নীলাচল পর্যন্ত দীর্ঘ পথ। সমস্ত পথই স্থলপথ নয়, জলপথও রয়েছে। তাই দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি, দুঃখ-কষ্ট, ভয়, আশঙ্কা সব ভুলে এগিয়ে যেতে হবে। এই পদযাত্রার জন্য সবারই একটা প্রস্তুতি থাকার প্রয়োজন রয়েছে। কিরূপ প্রস্তুতি? দীর্ঘ পথ, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হবে। পথ চলার সময় রাত্রিবেলায় যাত্রার বিরতি, রাত্রিবাসের উপযোগী আশ্রয়ের প্রয়োজন হবে। আহার নিদ্রারও আবশ্যক। পথ সহজ নয়, সরলও নয়। পথে বিপদ—এমন কি জীবন-সংশয়ের কারণ ঘটতে পারে। গৃহের সহজ স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার ব্যতিক্রম ঘটবে। সব ব্যতিক্রম হাসিমুখে মেনে নেবার প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার মতো কার কাছে কিরূপ সঙ্গতি আছে জানার প্রয়োজন। গৌরাঙ্গদেব তাই যাত্রার শুরুতেই একবার জিজ্ঞাসা করলেন—

পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সভা প্রতি।
কি সম্বল আছ কহ, কাহার সংহতি॥
কেবা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহত সকল॥ চৈঃ ভাঃ। অন্ত্য খণ্ড।

পথের শুরুতেই গৌরাঙ্গদেব একে একে সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—এমন দীর্ঘ পথ চলবার জন্য কি সম্বল নিয়ে এসেছো? পথ চলার কষ্ট লাঘব করবার জন্য পথ-যাত্রীরা সবাই তো কিছু না কিছু সঙ্গতি নিয়ে আসেন! তোমরা কি নিয়ে এসেছো? গৌরাঙ্গদেবের কথায় সবাই এক বাক্যে জানালেন—প্রভু, তোমার বিনা আজ্ঞায় কোনো দ্রব্যই তো সঙ্গে করে আনার শক্তি আমাদের নেই! আমরা যে তোমার ভক্ত, তোমার আজ্ঞা ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না।

গৌরাঙ্গদেব সুখী হলেন সবার উত্তর শুনে। নীলাচলের পথে এগিয়ে যেতে হবে সবাইকে। পথ চলায় কষ্ট হবে, ক্লান্তি আসবে, ভয় হবে। পথ চলা একরূপ সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধ হলেই তো জগন্নাথ দর্শন হবে। যথার্থ পথিক হবার জন্য

কি কি শিক্ষার প্রয়োজন, পথ চলতে চলতে গৌরাঙ্গদেব বললেন ভক্তদের : সাধনার পথ সহজ নয়। এই দীর্ঘ চলার পথে ক্লান্তি এসে বাধা দেবে। অবিশ্বাস এসে বিভ্রান্ত করতে চাইবে সবাইকে। পথ চলার কষ্ট, বিপত্তি এসে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থা হারাবে। প্রলোভন এসে দাঁড়াবে পথের সামনে। সাধনার পথে এই সব বাধা! এই বাধা দূর করতে হবে কৃষ্ণনাম স্মরণ করতে করতে। গৌরাঙ্গদেব সবার দিকে তাকিয়ে দৃঢ়তা লক্ষ্য করে খুশী হলেন।

প্রভু বলে কাহারো যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমার বড় সন্তোষ হইলা॥ চৈঃ ভাঃ। অন্ত্য খণ্ড।

আশ্বাস দিলেন ভক্তদের। বললেন—ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো। বিশ্বাসই সব চাইতে বড় সম্পদ। অদৃষ্টে লেখা থাকলে দুর্গম পথও সহজ…সরল হবে। সব কষ্টই লাঘব হবে। অরণ্যে পৌঁছেও আহার্য মিলে যাবে। অদৃষ্ট এমন যে—অনেক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে গৃহে থাকলেও কত দুর্দৈব আসে। আবার যেদিন অদৃষ্টে আহারের কথা লেখা থাকবে না, সেদিন রাজপুত্র হলেও ভাগ্যে উপবাস জুটবে। আবার এমনও হতে পারে, অজস্র আহার্য বস্তু থাকতেও কলহ করে অনশনে থাকতে হতে পারে। কলহ করে অন্ন স্পর্শ না করবার দিব্য দিয়ে অনাহারে থাকতে হতে পারে ক্রোধবশে। ভাগ্যে নেই, তাই আহার জুটবে না। আবার আচম্বিতে অসুস্থতা এসে অন্ন গ্রহণে বাধা দেবে। এ সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, মানুষের কি সাধ্য—সে সব কিছু করতে পারে!

গৌরাঙ্গদেব বললেন—দুর্গম পথযাত্রা, বিপদ তো থাকবেই। তাতে কি? বিশ্বাস থাকলে অসাধ্যও সাধ্য হবে। জানো না—

ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়েছেন অন্নছত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিবে সর্বত্র॥
আপনে ঈশ্বর সর্ব জনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই সুখ পায়॥ চৈঃ ভাঃ।

ভক্তগণকে আশ্বাস দিয়ে পথ চলতে চলতে এগিয়ে গেলেন। গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করে আদি গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে পৌঁছে গেলেন আটিসারা[১] গ্রামে।

এই গ্রামে বাস করেন পরম ধার্মিক অনন্ত পণ্ডিত। গৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করেই মুগ্ধ হলেন অনন্ত পণ্ডিত। ভক্তবৃন্দসহ গৌরাঙ্গদেবকে নিয়ে এলেন নিজ গৃহে। সেখানেই রাত্রিবাস করলেন সবাই। সারারাত কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণগান আর কৃষ্ণকীর্তন চললো।

সর্বরাত্রি কৃষ্ণ কথা কীর্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে রঙে॥ চৈঃ ভাঃ।

রাত্রি প্রভাত হোল। পাখীর কলকাকলীর ধ্বনি শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই গৌরাঙ্গদেব বিদায় নিলেন অনন্ত পণ্ডিতের কাছ থেকে। আবার পথ চলা শুরু হল। ভাগীরথীর কূল অনুসরণ করে তাঁরা পৌছে গেলেন ছত্রভোগ[২]। পরম পবিত্র স্থান ছত্রভোগ। পবিত্র গঙ্গার ধারা এই স্থান থেকেই শতমুখী হয়ে এগিয়ে গিয়েছে সাগরের দিকে। ছত্রভোগের সন্নিকটেই রয়েছে জলময় শিবলিঙ্গ। জলময় শিবলিঙ্গের স্থানের নাম অম্বুলিঙ্গ[৩] ঘাট।

মহারাজা ভগীরথ দীর্ঘ তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন সগর-সন্তানদের ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত করবার জন্য। দীর্ঘ পথ বেয়ে বেয়ে বহু জনপদ স্পর্শ করে গঙ্গা অবশেষে এসেছিলেন এই স্থানে। হিমালয় থেকে গঙ্গা অবতরণের পর শিব গঙ্গার অদর্শনে ব্যাকুল হয়েছিলেন। অবশেষে মর্ত্যে অবতরণ করে শিব অন্বেষণ করতে করতে ছত্রভোগে এসে দর্শন পেয়েছিলেন গঙ্গার। গঙ্গা অনুরাগে বিহ্বল শিব দর্শনমাত্র জলরাশির মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেখানেই জলরূপী শিব হয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলন হয়েছিল। শিবদর্শনে মুগ্ধ জগন্মাতা জাহ্নবী ভক্তিভরে পুজো দিয়েছিলেন শঙ্করের। তুষ্ট হয়েছিলেন মহেশ্বর। গঙ্গার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তিনি জলময় হয়ে অবস্থান করেছিলেন এই স্থানে। এই পরম পবিত্র স্থানের নাম অম্বুলিঙ্গ ঘাট। ছত্রভোগ গ্রাম মহাতীর্থ নামে প্রচারিত হয়েছিল। দেশ-দেশান্তর থেকে তীর্থ-যাত্রীরা আসতেন এই পবিত্র স্থানে। দর্শন করতেন, স্নান করতেন অম্বুলিঙ্গ ঘাটে। গৌরাঙ্গদেব ছত্রভোগে পৌছেই আনন্দে আত্মহারা হলেন। হরি হরি ধ্বনি তুলে তিনি এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন অম্বুলিঙ্গ ঘাটে। জল থেকে তিনি আর উঠতে চাইছিলেন না। নিত্যানন্দ সম্বরণ করলেন। এই ঘাটে ভক্তবৃন্দ স্নান করলেন। স্নান সমাপন করেই কূলে এসেই আনন্দে আবেগে আকুল হয়ে গেলেন গৌরাঙ্গদেব। দু চোখ বেয়ে তাঁর অবিরল ধারা বইছিল।

পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর॥ চৈঃ ভাঃ।

গৌরাঙ্গদেব যখন অম্বুলিঙ্গ ঘাটে স্নান সমাপনান্তে প্রেমানন্দে বিহ্বল, ঠিক সেই সময় ছত্রভোগের অধিকারী রামচন্দ্র খান দোলায় চড়ে আসছিলেন এই পথে। তরুণ সন্ন্যাসীকে দর্শন করে রামচন্দ্র দোলা থেকে অবতরণ করলেন। নবীন সন্ন্যাসীর কাছে এসে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলেন। এমন অপরূপদর্শন সন্ন্যাসী কোনদিন দেখেননি রামচন্দ্র খান। প্রণাম করলেন দণ্ডবত হয়ে। গৌরাঙ্গদেব বাহ্যজ্ঞান-শূন্য অবস্থায় শুধু ব্যাকুল হয়ে ডাকছিলেন—জগন্নাথ, হা জগন্নাথ! কোথায় তুমি জগন্নাথ!

ভূমিতে পড়ে আকুল ক্রন্দন করছিলেন তিনি। তাঁর ব্যাকুলতা, তাঁর আর্তি দর্শন করে রামচন্দ্র খান স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ঈশ্বরের নাম করে এমন ব্যাকুল ক্রন্দন, এমন ভক্তি, এমন নিষ্ঠা সিদ্ধপুরুষেই দেখা যায়। গৌরাঙ্গদেবের দেহের দিকে ভাল ভাবে তাকিয়ে আরো অবাক হলেন রামচন্দ্র খান। ইতিমধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত হতেই গৌরাঙ্গদেব আত্মস্থ হলেন। তাঁর সামনে করযোড়ে দাঁড়ানো রামচন্দ্র খানকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে?

রামচন্দ্র খান করযোড়ে দণ্ডবত হয়ে বললেন—প্রভু, আমি তোমার দাসানুদাস।

গৌরাঙ্গদেব অবাক হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। অবশ্য সবাই পরিচয় দিয়ে বললেন—এই দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী—নাম রামচন্দ্র খান।

গৌরাঙ্গদেব যেন খুশী হলেন পরিচয় পেয়ে। ব্যাকুল হয়ে বললেন—তুমি এ রাজ্যের অধিকারী। তুমিই পারবে। আমি নীলাচলে যাবো। জগন্নাথ দর্শন করবো। কেমন করে যাবো সেখানে, বল?

ঠিক এই সময় গৌড় দেশ আর উৎকল দেশের মধ্যে সম্পর্ক খুবই খারাপ। উভয় দেশের মানুষের মধ্যে যাতায়াত প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। উভয় দেশের রাজা সীমান্তে কড়া প্রহরী মোতায়েন করে রেখেছেন। পথিকদের দেখা পেলেই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর ভেবে প্রাণনাশ করে। এমন সাংঘাতিক বিপজ্জনক অবস্থা। রামচন্দ্র খান বলেন—জেনে শুনে তোমাকে কি করে এই পথে নীলাচলে যেতে দেবো বল?

গৌরাঙ্গদেব ব্যাকুল হয়ে বললেন—আমি সন্ন্যাসী। আমি জগন্নাথ দর্শন করবো। নীলাচলে আমাকে যে যেতেই হবে।

রামচন্দ্র খান আশ্বাস দিলেন—দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়। আজকের মতো

চলো আমার গ্রামে। ছত্রভোগে অবস্থান করো।

স্থির হল, রাত্রের অন্ধকারে যেমন করেই হোক গৌরাঙ্গদেব আর ভক্তদের নৌকাযোগে সীমান্ত পেরিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করা যাবে।

সারাদিন কীর্তন চলল। নামমাত্র ভোজন সমাপন করে গৌরাঙ্গদেব আবার কীর্তনানন্দে মত্ত হয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠলেন—হা জগন্নাথ। তুমি কত দূরে রয়েছ !—ক্রন্দন করতে লাগলেন উচ্চৈস্বরে। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল এক সময়। দু চোখে অবিরল ধারা।

অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, পুলক, স্তম্ভ, ঘর্ম।
কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্ম ॥ চৈঃ ভাঃ।

এই ভাবে রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতিক্রম হল। রামচন্দ্র খান এসে হাজির হলেন গৌরাঙ্গদেবের সামনে। করজোড়ে জানালেন—

নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হৈল বিদ্যমান ॥

গভীর রাত্রে ছত্রভোগ হতে বিদায় নিলেন গৌরাঙ্গদেব। ভক্তগণও বিদায় নিলেন সবার কাছ থেকে। গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত রামচন্দ্র খান এলেন। অজস্র ভক্ত হরিধ্বনির মধ্যে বিদায় দিলেন সবাইকে। ঘাট থেকে নৌকা ছাড়লো। এবার নৌকাপথে যাত্রা। প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষ, এপারে গৌড়ভূমি, ওপারে উৎকল দেশ। এই সমস্ত জলপথও নিরাপদ নয়। জলদস্যু রয়েছে এই পথে। নৌকাডুবি হলে হিংস্র জলজ প্রাণী আক্রমণ করবে। উৎকল সীমান্তে কড়া সীমান্ত-প্রহরী। রামচন্দ্র খানের বিশ্বস্ত মাঝি মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নৌকা চালায়। নৌকার প্রধান যাত্রী গৌরাঙ্গদেব। বাহ্যজ্ঞানশূন্য সন্ন্যাসী, নিরন্তর জগন্নাথ দেবের চিন্তায় মগ্ন। বিশাল জলরাশির বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে নৌকা অন্ধকারে। সময় অতিবাহিত হতে চলে। নীলাচলের পথ ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত হতে থাকে। গৌরাঙ্গদেব আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেন ভক্তদের—কীর্তন শুরু করো তোমরা।

মুকুন্দ কীর্তন শুরু করলেন। নৌকার ওপরে কীর্তন গান—নিরন্তর কীর্তন, সেই সঙ্গে নৃত্য। ভয় পেয়ে গেলো মাঝি।

কূলে উঠলে যে বাঘে লইয়া পলায়।
জলে পড়লে সে বোল-কুম্ভীরেই খায়॥
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥ চৈঃ ভাঃ। অন্ত খণ্ড।

মাঝি বাধ্য হয়েই বাধা দিতে চাইল। নৃত্য করলে নৌকো দোলে। বেশী দুললে জল উঠে নৌকো মাঝ-নদীতে ডুবে গেলে সবার মৃত্যু হবে। মৃত্যুভয়ে মাঝির মুখ যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কণ্ঠস্বরে ভীত মনের ছোঁয়া লাগে। গৌরাঙ্গদেব আশ্বাস দিলেন—ভয় নেই মাঝি! কোন ভয় নেই তোমার! নৌকো ডুবে যাবে না। গৌরাঙ্গদেব বললেন—কৃষ্ণনামে ভয় নাশ করে। কৃষ্ণ আমাদের রক্ষক। ভয় থেকে, মৃত্যু থেকে রক্ষা করবেন তিনি। তুমি জানো না—

বিষ্ণু চক্রে সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে ভক্ত জনের লঙ্ঘিতে॥ চৈঃ ভাঃ। অন্ত খণ্ড।

আশ্বাস পেয়ে মাঝি নৌকো বেয়ে নিয়ে চলে। এমনি কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চলে। পরিষ্কার আকাশ, সূর্যের কিরণ এসে পড়ে সবার ওপরে। বিশাল জলরাশির ওপরে সূর্যদেব যেন স্নিগ্ধ কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে চার ধারে। কীর্তনানন্দে মগ্ন গৌরাঙ্গদেব আর ভক্তবৃন্দ সময় ভুলে যান। এক সময় নৌকা এসে পৌঁছে যায় উৎকল দেশে।

নৌকো এসে ধীরে ধীরে কূলে ভেড়ায় শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে[৪]। গৌরাঙ্গদেব ভক্তগণসহ অবতরণ করলেন নৌকো থেকে। ওড্রদেশের মাটি স্পর্শ করেই প্রণাম করলেন গৌরাঙ্গদেব। এই মাটির বুকেই তো রয়েছে জগন্নাথক্ষেত্র। প্রয়াগ ঘাটের নামই: গঙ্গাঘাট। কাছেই শিবমন্দির। প্রাচীন শিবমন্দির—শোনা যায়, মহারাজা যুধিষ্ঠির এই শিব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গঙ্গাঘাটে স্নান সমাপন করে মন্দিরে মহেশ দর্শন করলেন গৌরাঙ্গদেব। ভক্তিভরে প্রণাম করে গৌরাঙ্গদেব ভিক্ষা করবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন গ্রামের দিকে। গ্রামে পৌঁছে ঘরে ঘরে গিয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। সুন্দর সুঠাম দেহ, সুললিত কণ্ঠ তরুণ সন্ন্যাসীর। মুগ্ধ হল গ্রামবাসী।

ভক্ষ্যদ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে ঘরে ঘরে।
সভেই সন্তোষে আনি দেয়েন প্রভুরে ॥
*   *   *
সন্তোষে জগদানন্দ করিল রন্ধন।
সভার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন ॥   চৈঃ ভাঃ।

ভোজনপর্ব সমাপন শেষে শুরু হল কৃষ্ণকীর্তন। সারাদিন সারারাত কীর্তন। সমস্ত গ্রামবাসী এসে যোগ দিল। কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা হয়ে উঠল সমস্ত গ্রামবাসী। উষাকালে গৌরাঙ্গদেব ভক্তবৃন্দ সহ আবার যাত্রা শুরু করলেন। কিছু পথ অতিক্রম করবার পর দানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। অচেনা বিদেশী মানুষ। দানী সবার পথরোধ করে পথকর চাইলেন সবার কাছ থেকে। সর্বপ্রথমই গৌরাঙ্গ-দেবকেই জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার সঙ্গে কতজন রয়েছে বল তো?

গৌরাঙ্গদেব বললেন—এই বিশ্বচরাচরে আমার কেউ নেই। আমিও কারো নই।

দানী অবাক হয়ে বলল—সে কি! তোমার সঙ্গে কেউ নেই?

গৌরাঙ্গদেব বললেন—

এক আমি, দুই নাহি সর্বথা আমার।
কহিতে নয়নে বহে অবিরল ধার ॥   চৈঃ ভাঃ।

গৌরাঙ্গদেবের কণ্ঠস্বর, প্রেমময় দৃষ্টি, জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল দানী। এ কি অদ্ভুত তরুণ সন্ন্যাসী! এ তো সাধারণ সন্ন্যাসী নয়? দানী বললো—গোসাঞি, তোমার কাছ থেকে কোন পথকর গ্রহণ করবো না। তবে আর সবার কাছ থেকে কর পেলেই পথ ছেড়ে দেবো।

গৌরাঙ্গদেব পথমুক্ত হয়ে কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভক্তগণ বিষাদগ্রস্ত হলেন। এ কি খেয়াল গৌরাঙ্গদেবের! সবাইকে ছেড়ে তিনি একাকীই এগিয়ে যাবেন নাকি? নিত্যানন্দ অবশ্য প্রবোধ দিলেন সবাইকে—কোন চিন্তা নেই তোমাদের। গৌরাঙ্গ ভক্তদের ত্যাগ করে কোথায়ও যাবেন না।

দানী বললো—তোমরা তো সন্ন্যাসীর সঙ্গী নও। তোমরা সন্ন্যাসীও নও। তোমাদের পথকর না দিলে আর যেতে দেবো না।

অদূরেই গৌরাঙ্গদেব উপবিষ্ট। দু চোখ বেয়ে অবিরল জলধারা বইছে। মুখে

তাঁর অবিশ্রান্ত কৃষ্ণনাম। এক অদ্ভুত ব্যাকুলতা, এমন এক বিস্ময়কর আর্তি তো সাধারণ সন্ন্যাসীর মধ্যে দেখা যায় না! দানী কেমন যেন হতবিহ্বল হল! মুগ্ধ হল সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে। এ তো সহজ সাধারণ সন্ন্যাসী নয়! কৃষ্ণনামে দু চোখ বেয়ে এত জল আসে কেমন করে? জগন্নাথ দর্শনের জন্য এ কি অদ্ভুত ব্যাকুলতা! ভক্তদের কাছে গিয়ে দানী জিজ্ঞাসা করলো—সত্যি করে বলো দেখি—

কে তোমা, কার লোক, কহ তো ভাঙ্গিয়া? চৈঃ ভাঃ।

দানীর এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন নিত্যানন্দ। তিনি বললেন—ঐ সন্ন্যাসীই আমাদের ঠাকুর। তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আমরা সবাই তাঁর ভৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পরিচয় দিতে গিয়ে ভক্তগণের দু চোখ বেয়ে জল বইতে শুরু করলো। সবার প্রেমবিহ্বলতায় মুগ্ধ হয়ে গেল দানী নিজেই। মুহূর্তের মধ্যে তার অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটে গেল। দানী গৌরাঙ্গদেবের কাছে দণ্ডবত হয়ে ক্ষমা চাইল। বললো করযোড়ে—

অপরাধ ক্ষমা কর করুণা সাগর।
চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর॥ চৈঃ ভাঃ।

সবাইকে ছেড়ে দিল দানী। বিদায় নেবার আগে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে জয়ধ্বনি দিল। করযোড়ে বিদায় নিল গৌরাঙ্গদেবের কাছ থেকে। ভক্তবৃন্দ সহ গৌরাঙ্গদেব পথ চলা শুরু করলেন। বিরুদ্ধবাদী, সাধারণ মানুষ···সবার হৃদয় জয় করলেন তাঁর অপরূপ মহিমায়। কৃষ্ণ গুণগান গাইতে গাইতে সবার কাছে দীর্ঘ পথ যেন সংক্ষিপ্ত হতে চললো। তাঁরা এসে পৌঁছে গেলেন স্বর্ণরেখা[৫] নদীর তীরে। স্বর্ণরেখার জল স্বচ্ছ ও নির্মল। সেই শীতল জলে অবগাহন করলেন সবাই। তারপর ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলেন জলেশ্বর[৬]। এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ শিবক্ষেত্র জলেশ্বর। বিখ্যাত শিবমন্দির রয়েছে। গন্ধপুষ্প, ধূপ দীপ নিয়ে পুজো করছিলেন পূজারী ব্রাহ্মণগণ। চতুর্দিকে নৃত্যগীত, বাদ্যযন্ত্রের কল-কোলাহল। মন্দিরে শিবের বৈভব দর্শন করে মুগ্ধ হলেন গৌরাঙ্গদেব। শিব গুণগান করে তিনি কীর্তন করতে শুরু করলেন। জলেশ্বরে রাত্রিবাস করলেন সবাই। উষাকালে মহেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভক্তবৃন্দ সহ গৌরাঙ্গদেব পথ চলতে শুরু করলেন। দিনান্তে পৌঁছে গেলেন রেমুনা[৭] গ্রামে। রেমুনায় বিখ্যাত

ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দির। মন্দিরে পৌঁছেই গোপীনাথ দর্শন করলেন গৌরাঙ্গদেব। ভক্তবৃন্দ সহ সঙ্কীর্তন আরম্ভ করলেন মন্দিরের সামনে। নৃত্য গীত সহ সঙ্কীর্তন। গৌরাঙ্গদেবের পূর্বকথা মনে পড়ছিল। এই ক্ষীর-চোরা গোপীনাথের কথা তিনি শুনেছেন। ভক্তবাঞ্ছাপূরণকারী গোপীনাথ। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। গোপীনাথের প্রসিদ্ধ প্রসাদ ক্ষীর।

মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছে কথা॥
চৈঃ চঃ। আদি লীলা ৪র্থ পঃ।

সারাদিন কীর্তন গান আর নৃত্য, সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। গৌরাঙ্গদেব ক্ষীর-চোরা গোপীনাথের কাহিনী বলেন ভক্তদের। মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য গোপীনাথ ক্ষীর প্রসাদ চুরি করে রেখেছিলেন।

বহু পূর্বের কথা। মাধবেন্দ্র পুরী বৃন্দাবনে এসেছিলেন। বৃন্দাবন ভ্রমণ করতে করতে এসেছিলেন গোবর্ধনগিরিতে। প্রেমে মত্ত মাধবেন্দ্র পুরী গোবর্ধনগিরি পরিক্রমা করতে গিয়ে স্থানে স্থানে প্রেমে অচেতন হয়ে যেতেন। ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে এসেছিলেন গোবিন্দ কুণ্ডে। সেখানে কুণ্ডে স্নান সমাপন করে সন্ধ্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন বৃক্ষতলে। রাত্রিবাস করবেন বৃক্ষতলায়—স্থির করেছিলেন। বিরক্ত সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরী। সারাদিন পথ পরিক্রমা, ভোজন সমাপন হয়নি। এমন সময় এক গোপবালক দুগ্ধভাণ্ড নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল পুরী সন্ন্যাসীর সামনে। বালক বলেছিল—পুরী, এই দুগ্ধ তুমি পান করো। তুমি তো কোন কিছুই মেগে খাও না। কি ধ্যান করো তুমি, জানি না। এই দুগ্ধ তুমি গ্রহণ করো।

পুরী বলেছিলেন—কে তুমি বালক? তোমার বাস কোথায়? আমি যে উপবাস, এ তুমি কেমন করে জানলে?

গোপবালক বলেছিলেন—আমি এই গ্রামেতেই বসবাস করি। আমাদের গ্রামে কেউ উপবাসী থাকে না।

কেহ অন্ন মাগি খায়, কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দিয়েত আহার॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

কুণ্ড থেকে জল নিয়ে মেয়েরা তোমাকে দেখেছিলেন। তাঁরাই এই দুগ্ধভাণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি এই দুগ্ধ পান করে ভাণ্ডটি ধুয়ে রেখে দেবে। আমি এসে এটি নিয়ে যাবো।

মাধবেন্দ্র পুরী দুগ্ধ পান করে ভাণ্ডটি ধুয়ে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু আর এলো না গোপবালক। বিস্মিত হয়েছিলেন পুরী গোসাঞি। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঠাকুরের নাম করছিলেন। ঘুম আসে না কিছুতেই। গোপবালকটির মুখ বার বার ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। শেষরাত্রে তন্দ্রার মধ্যে স্বপ্নে পুরী গোসাঞি দেখলেন—সেই বালককে। বালক গোসাঞিকে নিয়ে গিয়েছিলেন হাত ধরে এক কুঞ্জের কাছে। কুঞ্জ দেখিয়ে বলেছিলেন বালক—এই কুঞ্জেই আমার বাস। দীর্ঘকাল আমি এখানে রয়েছি। শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, দাবাগ্নিতে মহা দুঃখ পাই। তুমি আমাকে এই কুঞ্জ থেকে বার করে নিয়ে চল ঐ গোবর্ধন পর্বতে। সেখানে মঠ স্থাপন করে আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর। আমার অঙ্গমার্জন করে স্নান করাও কুণ্ডের শীতল জলে।

> বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
> কবে আসি মাধব আবার করিবে সেবন॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

বালক বলেছিলেন—আমি গোবর্ধনধারী শ্রীগোপাল।

বালক অন্তর্ধান হতেই মাধবেন্দ্র পুরীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন তিনি। সারা দেহে এক অদ্ভুত পুলক। অপূর্ব রোমাঞ্চ। কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন গোসাঞি। এ কি করেছেন তিনি! শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেও তিনি চিনতে পারেননি! দুঃখে বেদনা আর অনুশোচনায় আকুল হয়ে কেঁদেছিলেন তিনি। তারপর সুস্থির হয়ে প্রাতঃস্নান সম্পন্ন করেছিলেন কুণ্ডের শীতল জলে। তারপর গ্রামের মধ্যে গিয়ে বলেছিলেন গ্রামবাসীদের সমস্ত ঘটনা। গ্রামবাসীরা কুঞ্জে উপস্থিত হয়ে কুঞ্জের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে মাটি খুঁড়ে যথার্থই মহাভাবী ঠাকুরকে উদ্ধার করেছিল। গ্রামের মধ্যে শক্তিশালী মানুষ একত্র হয়ে ঠাকুরকে গোবর্ধন পর্বতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ব্রাহ্মণরা সব নবঘট নিয়ে জল এনেছিল গোবিন্দকুণ্ড থেকে। নানা বাদ্যভাণ্ড, ভেরী বেজেছিল। দধি দুগ্ধ নিয়ে অভিষেক হয়েছিল গোপালের। তারপর ষোড়শ উপচারে পূজা ভোগ অন্নকূট সম্পন্ন হয়েছিল।

গোপাল প্রতিষ্ঠিত হবার পর পুরী গোসাঞি নিয়মিত সেবা করছিলেন

গোপালের। সমস্ত ব্রজবাসী জেনেছিলেন যে গোপাল প্রকট হয়েছে। দলে দলে নর-নারী আসতেন গোবর্ধন পর্বতে প্রতিষ্ঠিত গোপালকে দর্শন করবার জন্য। ভোগ-রাগের জন্য নিয়মিত দ্রব্য আসতো। মথুরার ধনী ও মানী লোক স্বর্ণ রৌপ্য, মূল্যবান বস্ত্র নিয়ে আসতেন গোপালকে নানা সাজে সাজাবার জন্য। সবার দানে এমনি ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল। এক ভক্ত ক্ষত্রিয় মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এক এক ব্রজবাসী গাভী দান করতে শুরু করায় গোপালের দশ হাজার গাভী হয়েছিল। পুরী গোসাঞি একাকী। গোপালের বিষয়-আশয় দেখাশুনা করে নিয়মিত পূজা ভোগ-রাগের জন্য গৌড়দেশ থেকে এসে দুই বৈরাগী যোগ দিয়েছিলেন পুরী গোসাঞির সঙ্গে। এই দুই শিষ্যের ওপরে গোপালের সেবার ভার দিয়েছিলেন। এমনি দুই বৎসর গোপালের সেবা করেছিলেন পুরী গোসাঞি। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলেন পুরী গোসাঞি। গোপাল বলেছিলেন—গোসাঞি, তুমি আমাকে এত যত্ন-আত্তি করো, এত সেবা করো, তবু আমার দেহের জ্বালা নির্বাপিত হল না। আবার এই তাপ যাতে জুড়ায়, সে জন্য তুমি নীলাচলে গিয়ে সেখান থেকে মলয়জ চন্দন নিয়ে এসো। এই চন্দন আমার দেহে লেপন করলে আমার তাপ শীতল হবে।

স্বপ্ন ভাঙতেই পুরী গোসাঞি প্রেমাবেশে আবিষ্ট হয়েছিলেন। প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে যাত্রা করেছিলেন পূর্বদেশে। প্রথম তিনি গৌড়দেশে প্রবেশ করে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। পুরীর প্রেমে মুগ্ধ আচার্য দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর কাছ থেকে। তারপর শান্তিপুর থেকে যাত্রা করে পুরী গোসাঞি অগ্রসর হয়েছিলেন নীলাচলের পথে। যাত্রাপথে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন রেমুনায় গোপীনাথ দর্শন করে। গোপালের কথা মনে পড়তেই প্রেমে বিহ্বল হয়েছিলেন তিনি। গোপীনাথের সাজসজ্জা ভোগরাগ সবই দর্শন করেছিলেন তিনি। গোপীনাথের উত্তম ভোগ জানতে চেয়েছিলেন তিনি গোপীনাথের পূজারীর কাছ থেকে। উদ্দেশ্য এই মত ভোগ গোপালের জন্য ব্যবস্থা করবেন তিনি। ব্রাহ্মণ পূজারী পুরী গোসাঞিকে ভোগের বিবরণ দিয়েছিলেন। গোপীনাথের সান্ধ্য ভোগ ক্ষীর। দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরে ক্ষীর দিতে হয় গোপীনাথের জন্য। এই ভোগের নাম অমৃতকেলি। গোপীনাথের ক্ষীর প্রসাদ প্রসিদ্ধ। পুরী গোসাঞি স্বচক্ষে সে ভোগ দর্শন করেছিলেন। ক্ষীর ভোগ দর্শন করে পুরী গোসাঞি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন—

অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

ঠিক সেই সময় ভোগ-আরতি সম্পন্ন হয়েছিল। অপলক দৃষ্টিতে দর্শন করে মনে মনে লজ্জা পেয়েছিল পুরী গোসাঞি ভোগের ইচ্ছার জন্য। কাউকে কিছু না বলে গোপীনাথকে প্রণাম করে তিনি গ্রামে শূন্য হাটে বৃক্ষতলায় অবস্থান করেছিলেন রাত্রিবাস করবার জন্য। ঠাকুরের নাম করছিলেন মনে মনে। কখনো কীর্তন করছিলেন। ক্ষীর পাবার ইচ্ছাকে অপরাধ মনে করে পরম লজ্জা পেয়েছিলেন

অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নইলে উপবাস॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীর ইচ্ছা হৈল তাহা মানি অপরাধ॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

ভোগ আরতি সমাপ্তির পর পূজারী ব্রাহ্মণ গোপীনাথকে শয়ন দিয়ে চলে গিয়েছিলেন ঘরে। রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। স্বপ্নে গোপীনাথ বলেছিলেন—ঠাকুর, ওঠো। উঠে মন্দিরের দরজা খোল। দেখো, এক পাত্র ক্ষীর রেখেছি এক সন্ন্যাসীর জন্য। দেখো, আমার আঁচলে ঢাকা ক্ষীরপাত্র লুকিয়ে রেখেছি। তুমি আমার মায়ার জন্য বুঝতে পারো নি। এই ক্ষীর নিয়ে, হাটে বসে আছে মাধব সন্ন্যাসী, তাঁকে দান করো!

স্বপ্ন দেখে পূজারী ব্রাহ্মণের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। স্নান করে শুদ্ধ চিত্তে মন্দিরে গিয়ে দরজা খুলেছিলেন। তারপর বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি।

ধড়ার আঁচল তলে পাইলো সে ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লঞা হইল বাহির॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

পূজারী ব্রাহ্মণ ক্ষীরের পাত্র নিয়ে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে হাটে উচ্চস্বরে ডাকতে শুরু করেছিলেন—মাধবেন্দ্র পুরী নাম নিয়ে। মাধবেন্দ্রকে তো পূজারী ব্রাহ্মণ চেনেন না। অথচ গোপীনাথ তাঁর জন্য ক্ষীর প্রসাদ চুরি করে রেখেছেন। কি ভাগ্যবান সেই সন্ন্যাসী! কোথায় সেই মাধবেন্দ্র পুরী? হাটের মাঝখানে এসে পূজারী ব্রাহ্মণ ডাকছিলেন।

বৃক্ষতলায় বসে ছিলেন পুরী গোসাঞি। অবাক হয়ে শুনছিলেন পূজারী ব্রাহ্মণ

উচ্চৈঃস্বরে ডাকছিলেন। কি বলছিলেন তিনি ?

ক্ষীর লেহ এই যার নাম মাধব পুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণ।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

পুরী গোসাঞি এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিয়েছিলেন পূজারী ব্রাহ্মণকে। ক্ষীর দিয়ে পূজারী ব্রাহ্মণ দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে সমস্ত স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলেছিলেন। ক্ষীর হাতে নিয়ে পুরী গোসাঞি স্তব্ধ হয়ে যান। তাঁর দু চোখ বেয়ে অবিরল ধারা বয়ে চলেছিল। অবাক হয়ে বলেছিলেন—কি ভাগ্য আমার! আমার মত একজন সাধারণ সন্ন্যাসীর জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর প্রসাদ চুরি করে রেখেছেন! পুরী গোসাঞি প্রেমাবিষ্ট হয়ে ক্রন্দন করেছিলেন। প্রেম দেখে পূজারীও বিস্মিত হয়েছিলেন। ক্ষীর ভক্ষণের পর পাত্র প্রক্ষালন করে পাত্রটি রেখেছিলেন বহির্বাসের মধ্যে। রাত্রি শেষ হতেই অন্ধকারের মধ্যে মাধবেন্দ্র পুরী রেমুনা[৮] ত্যাগ করেছিলেন। কারণ, এই কাহিনী প্রচারিত হলে ভিড় হবে। এতে প্রতিষ্ঠা হতে পারে, এই ভয়ে পুরী গোসাঞি গোপীনাথকে প্রণাম করে চলে গিয়েছিলেন নীলাচলে।

নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করে মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমে বিহ্বল হয়েছিলেন। জগন্নাথের সেবকের কাছে গোপালের বৃত্তান্ত বলেছিলেন। গোপাল চন্দন চেয়েছে এ কথা শুনে জগন্নাথের সেবকেরা যত্ন করে চন্দন, কর্পূর সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর সংগৃহীত সমস্ত চন্দন ও কর্পূর রাজপাত্রের সাহায্যে এক ব্রাহ্মণ সেবককে বহন করবার জন্য পুরী গোসাঞিকে সঙ্গে দিয়েছিলেন জগন্নাথের সেবকেরা। চন্দন সংগ্রহ করে পুরী গোসাঞি নীলাচল ত্যাগ করে আবার পৌঁছে গিয়েছিলেন রেমুনায়। গোপীনাথের চরণ দর্শন করে প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করেছিলেন তিনি। পূজারী ব্রাহ্মণ তাঁকে চিনতে পেরেই সম্মান করে মন্দিরে অবস্থানের বন্দোবস্ত করেছিলেন। ক্ষীর প্রসাদ দিয়েছিলেন তাঁকে। সেই রাত্রেই দেবালয়ে রাত্রিবাস করবার সময় স্বপ্নে গোপালের দর্শন পেয়েছিলেন। গোপাল বলেছিলেন—মাধব, কর্পূর, চন্দন যা নীলাচল থেকে এনেছো, সেগুলো গোপীনাথের অঙ্গে লেপন কর। মাধবেন্দ্র পুরী অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। গোপাল বলেছিলেন—গোপীনাথের অঙ্গ আর আমার অঙ্গ এক—অভিন্ন।

ক্ষীরচোরা গোপীনাথের কাহিনী শোনাতে শোনাতে গৌরাঙ্গদেব মূর্ছিত হলেন ভাবাবেশে। মূর্ছা ভাঙতেই দু চোখের জলে কৃষ্ণগান গাইতে লাগলেন। গোপীনাথের সেবক গৌরাঙ্গদেবের প্রেম, ভক্তি দর্শন করে মুগ্ধ হলেন। সেবক ব্রাহ্মণ বুঝলেন—এই তরুণ সন্ন্যাসী অসাধারণ, সিদ্ধপুরুষ। ঠিক সেই সময় মন্দিরের ভোগ সমাপ্ত হল। ঠাকুর শয়ন দিয়ে পূজারী ব্রাহ্মণ গৌরাঙ্গদেবের সামনে বারোটি ভাঁড় ক্ষীর প্রসাদ এনে হাজির হলেন। করজোড়ে অনুরোধ করলেন—এই প্রসাদ তোমরা সবাই গ্রহণ কর।

ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চক্ষীর লৈলা॥ চৈঃ চঃ। আদি লীলা।

মহানন্দে রেমুনায় একদিন অতিবাহিত করবার পর গৌরাঙ্গদেব ভক্তগণ সহ আবার যাত্রা শুরু করলেন। দারুণ উৎসাহে আর আনন্দে দীর্ঘপথ স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে তাঁরা পৌঁছে গেলেন যাজপুর। যাজপুর অত্যন্ত পবিত্র স্থান। এই দেবস্থানের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বৈতরণী নদী। কথিত আছে, এই বৈতরণী পারাপার করলে সর্ব পাপ দূরে যায়। যাজপুরে অনেকগুলো মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে বিখ্যাত দশাশ্বমেধি ঘাট। ভক্তগণ সহ গৌরাঙ্গদেব বৈতরণীর শীতল জলে স্নান করলেন। তার পর আদি বরাহ মূর্তি দর্শন করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন গৌরাঙ্গদেব। ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে বরাহ অবতার···! যাজপুর[৯] গ্রাম থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে মহানন্দে ভোজন সমাপন করলেন সবাই। সারাদিন সারারাত কীর্তনানন্দে অতিবাহিত হল। তার পর পাখী ডাকবার আগেই অতি প্রত্যুষে আবার শুরু হল পদযাত্রা। যাজপুর গ্রামের পর কটক নগর[১০]। ভাগাবতী মহানদীর তীরে এসে পৌঁছেই গৌরাঙ্গদেব ভক্তদের নিয়ে স্নান সম্পন্ন করলেন শীতল জলে। কটক নগরের পরেই তাঁরা পৌঁছে গেলেন বিদ্যানগর। এই বিদ্যানগরের কাছেই বিখ্যাত সাক্ষীগোপালের[১১] মন্দির। পথ চলতে চলতে নিত্যানন্দ বলেছিলেন সাক্ষীগোপালের কথা। তরুণ ব্রাহ্মণ কুমারের আকুল অনুরোধে গোপাল স্বয়ং বৃন্দাবন থেকে এসেছিলেন বিদ্যানগর গ্রামের কাছে সাক্ষী দিতে। নিত্যানন্দ এই মন্দির দর্শন করেছিলেন পূর্বে একবার এসে। তাই সাক্ষীগোপাল তাঁর অতি পরিচিত।

বিদ্যানগর গ্রামের দুই ব্রাহ্মণ বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন তীর্থ দর্শনের মানসে। দুই ব্রাহ্মণের একজন বৃদ্ধ, অপরজন তরুণ যুবক। তরুণ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধকে সঙ্গী করে

এগিয়ে গিয়েছিলেন বৃন্দাবনের পথে। দীর্ঘ পথ, পথ চলতে চলতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। পথ চলার কষ্টে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তরুণ ব্রাহ্মণ সমস্ত পথে বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিতে দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। অসুস্থতায় কাতর হলে সেবা-যত্ন করতেন, শুশ্রূষা করতেন যত্ন করে। এমনি করেই সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে দুজনে পৌঁছে গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবন দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বৃন্দাবনের গোপাল দর্শন করে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন। সার্থক হয়েছিল তাঁর তীর্থযাত্রা। ব্রাহ্মণের দু চোখ বেয়ে জল পড়েছিল। আনন্দে বিহ্বল হয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন তরুণ ব্রাহ্মণকে। বলেছিলেন—তোমার জন্যই আমার এই তীর্থদর্শন সম্ভব হয়েছে। এই দীর্ঘ পথে তুমি আমাকে নিয়ে গেছো। দুঃখে কষ্টে হতাশ হলে উৎসাহ দিয়েছো। অসুস্থতায় সেবাযত্ন করেছো, শুশ্রূষা করেছো। আত্মীয়স্বজনেরা যা করেন না, তুমি তাই করেছো।

তরুণ ব্রাহ্মণ বাধা দিয়েছিলেন—আপনি আমার তীর্থপথের সঙ্গী। আমরা একই গ্রামের মানুষ। আপনার আপদে-বিপদে দেখা তো কর্তব্য।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলেছিলেন—তুমি যত কথাই বল, তোমার ব্যবহারে আমি প্রীত। আমি অকৃতজ্ঞ নই। তাই ভেবেছি, দেশে গিয়ে আমি তোমাকে কন্যাদান করবো।

তরুণ ব্রাহ্মণ বাধা দিয়েছিলেন—আপনি যে অসম্ভব কথা বলছেন! অসম্ভব শুধু নয়, অবান্তর। আমি বিত্তহীন দরিদ্র। তার ওপর আমি নিম্নজাতের ব্রাহ্মণ। আমাকে কন্যা সম্প্রদান করলে আত্মীয়স্বজনরা মানবেই বা কেন?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কোন কথাই শুনছিলেন না। তিনি বলছিলেন—তুমি বিত্তহীন দরিদ্র হতে পারো। কিন্তু আমি তোমার হৃদয়ের স্পর্শ পেয়েছি। তুমি ব্রাহ্মণ, এই পরিচয়ই বড় কথা। আমি তোমার কোন কথাই শুনবো না।

তরুণ ব্রাহ্মণ হেসে বলেছিলেন—আপনি তুষ্ট হয়ে এসব কথা বলছেন বটে, দেশে গিয়ে এসব কথা ভুলে যাবেন। এসব পথের কথা—পথেই থেকে যাবে। ঘরে আর পৌঁছবে না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলেছিলেন—একে তুমি কথার কথা মনে ক'রো না। আমি অঙ্গীকার করছি—আমার কথা কখনো মিথ্যা হবে না।

তরুণ ব্রাহ্মণ হেসেছিলেন—আমি এসব বিশ্বাস করি না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলেছিলেন—আমি এই গোপালের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি। আমার এ অঙ্গীকার পালন করবোই।

যথারীতি গ্রামে ফিরে আসতেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর তরুণ ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা-

সাক্ষাৎ কম হতে শুরু হয়েছিল। কন্যা সম্প্রদানের কথা প্রায় ভুলে যেতেই শুরু করেছিলেন ব্রাহ্মণ। হঠাৎ মনে পড়তেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সমস্ত ঘটনা বলেছিলেন। গ্রামের আত্মীয়-স্বজন বাধা দিয়েছিলেন সেদিন। এমন কি স্ত্রী-পুত্রও প্রচণ্ড আপত্তি করেছিল।

বৃদ্ধ বলেছিলেন—আমি তীর্থস্থানে—বিশেষ করে গোপালের সামনে অঙ্গীকার করেছিলাম। এখন অঙ্গীকার পালন না করলে যে পাপ হবে, ধর্ম থেকে পতিত হব।

একদিন যথারীতি তরুণ ব্রাহ্মণ এসে পূর্ব অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে। অসহায়ের মতো নীরব হয়ে ছিলেন বৃদ্ধ। আত্মীয়-পরিজন এসে প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিল। কোথায় কোন্ তীর্থের পথে কথা দিয়েছে, সে তো কথার কথা। এই সব কথা মেনে নিতে হবে নাকি?

তরুণ ব্রাহ্মণকে বলেছিল সবাই—তোমাকে কন্যা দান করবার যে অঙ্গীকার করেছিলেন বৃদ্ধ—সে আমরা বিশ্বাস করি না। উনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন তার কোন সাক্ষী আছে?

তরুণ ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি। তবু সবার কথায় বলেছিলেন—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অঙ্গীকার করেছিলেন এ কথা সত্য। অঙ্গীকারের সময় তো কেউ ছিলেন না।

বৃদ্ধের আত্মীয়-পরিজন নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছিলেন—তবে, সাক্ষী না থাকলে তোমার কথার সত্যতা বুঝবো কি করে?

তরুণ ব্রাহ্মণ বলেছিলেন—তবে সেদিন বৃন্দাবনে গোপালের সামনে অঙ্গীকার করেছিলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

—গোপালের সামনে! সে তো মূর্তি! উপহাস করেছিল সবাই।

তরুণ ব্রাহ্মণ সরল ও বিশ্বাসী। তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁ, বৃন্দাবনের সেই গোপালের সামনেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বৃদ্ধ। আমি বৃদ্ধকে বলেছিলাম—আপনি দেশে গিয়ে সব ভুলে যাবেন। বৃদ্ধ বলেছিলেন—গোপাল তো সাক্ষী রইল।

তরুণ ব্রাহ্মণের কথায় আত্মীয়-স্বজনেরা উপহাস করেছিলেন—ঐ গোপাল এখানে এসে সাক্ষী দেবে নাকি?

তরুণ ব্রাহ্মণের দারুণ আত্মবিশ্বাস। কেন সাক্ষী দেবেন না গোপাল? ব্রাহ্মণ বলেছিলেন—গোপাল সাক্ষী দেবেন বৈকি!

অবশেষে স্থির হয়েছিল: বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলেছিলেন তরুণ ব্রাহ্মণকে—ব্রাহ্মণ, শোন

বৃন্দাবনের গোপাল যদি সাক্ষী দেয় তোমার জন্য, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে কন্যা দান করবো।

তরুণ ব্রাহ্মণের মনে জ্বলন্ত বিশ্বাস। নিশ্চয়ই সাক্ষী দেবেন গোপাল। আজ এই দুঃসময়ে গোপাল নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। দারুণ আত্মবিশ্বাস আর উৎসাহ নিয়ে ব্রাহ্মণ আবার গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে। গোপাল দর্শন করে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, নিষ্ঠা আর ভক্তি।

গোপালকে বলেছিলেন—তুমি তো করুণাময়। তুমি কৃপা করলে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারো। আমি তোমার শরণাগত। কন্যা পাবো—এতে আমার গৌরব নেই, মোহ নেই, আনন্দও নেই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমাকে সাক্ষী করে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সেই সত্য আজ মিথ্যায় পরিণত হতে চলেছে। আজ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তুমি আমাকে কৃপা করো।

তরুণ ব্রাহ্মণের সরলতা, ব্যাকুলতা, নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন গোপাল—বিপ্র, আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি নিশ্চিন্তে গৃহে যাও। সেখানে সভায় আমাক স্মরণ করলে আবির্ভূত হয়ে সাক্ষী দেব তোমার জন্য।

ব্রাহ্মণ বলেছিলেন করযোড়ে—প্রভু, তুমি যদি চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করে দর্শন দাও আর সাক্ষী দাও ঐ বেশেই, সবার প্রত্যয় হবে না। তুমি এই মূর্তিতেই যাবে আমার সঙ্গে, সর্ব সমক্ষে সাক্ষী দেবে। তবে তো সত্য প্রমাণিত হবে।

কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কোথায় না শুনি।
বিপ্র বলে প্রতিমা হঞা কহ কেন বাণী॥
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য করণ॥ চৈঃ চঃ।

গোপাল হেসে বলেছিলেন তথাস্তু! আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবো তোমার গ্রামে সাক্ষী দিতে। তবে তোমার পেছনে পেছনে চলবো নূপুরের ধ্বনি তুলে। তুমি কিন্তু পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখবে না। নূপুরের শব্দ শুনে শুনে যাবে এগিয়ে। পিছন ফিরে তাকালেই কিন্তু আমি থেমে যাবো। আর তোমার সঙ্গে যেতে পারবো না। এই অঙ্গীকার করলে আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

তাই স্থির হয়েছিল। নূপুরের ধ্বনি শুনে শুনে সুদূর বৃন্দাবন থেকে ব্রাহ্মণ এসেছিলেন স্বগ্রামে—বিদ্যানগরের কাছে। স্বগ্রামের কাছে এসে ব্রাহ্মণ ভেবেছিলেন—

গোপাল আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন। আমি তাঁর নূপুরের ধ্বনি শুনে শুনেই এসেছি। গোপালকে দেখিনি। এবার গ্রামে এসে গোপালকে দর্শন করে—বলতে পারবো সবাইকে—বৃন্দাবন থেকে গোপাল এসেছেন ভক্তের আকুল আহ্বানে।

সামান্য অবিশ্বাস, সামান্য সন্দেহ…ব্রাহ্মণ পিছন ফিরে তাকাতেই গোপাল হেসে বলেছিলেন—বিপ্র, আমি এই স্থানেই রইলাম। এই স্থানেই অপেক্ষা করবো সাক্ষী দেবার জন্য। তুমি গৃহে যেয়ে সবাইকে নিয়ে এসো। অঙ্গীকার মতো আর তো আমি এগুতে পারবো না।

তরুণ ব্রাহ্মণ বাধ্য হয়ে গ্রামে গিয়ে সবাইকে জানিয়েছিলেন—গোপাল বৃন্দাবন থেকে এসেছেন সাক্ষী দিতে।

শুনিয়া সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবত করে॥ চৈ: চঃ।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোপালকে দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। দণ্ডবৎ হয়েছিলেন গোপালের সামনে এসে। সকল লোকের সামনে কন্যা দান করেছিলেন তরুণ ব্রাহ্মণকে।

এই সেই সাক্ষীগোপাল। দীর্ঘকাল ধরে পুজো পেয়ে যান এই গোপাল। নিত্যা-নন্দ গোপালের কাহিনী শোনালেন সবাইকে।

কাহিনী শেষ হতেই গৌরাঙ্গদেব ভক্তবৃন্দসহ গোপাল দর্শন করলেন। গোপালের গুণ কীর্তন করে আনন্দে আবেশে আত্মহারা হলেন গৌরাঙ্গদেব। সারারাত্রি কীর্তনানন্দে অতিবাহিত করবার পর প্রত্যুষে পদযাত্রা শুরু করলেন। পথ এবার সহজ ও সরল; নীলাচল আর দূরে নয়। কীর্তনানন্দে সমস্ত পথ অতিক্রম করে পৌঁছে গেলেন সবাই ভুবনেশ্বরে।

ভুবনেশ্বরের[১২] আর এক নাম গুপ্তকাশী। এই স্থানেই অবস্থান করেন শঙ্কর ভগবান। এই পবিত্র স্থানে রয়েছে বিন্দু সবোবর। সর্বতীর্থের জল বিন্দু বিন্দু করে সংগ্রহ করেই এই সরোবরের জন্ম হয়েছিল। শিবপ্রিয় এই সরোবরে স্নান করলেন গৌরাঙ্গদেব। সমস্ত ক্লান্তি—পথ চলার সব অসুবিধা দূর হয়ে গেলো। স্নান সমাপন করে গেলেন শিব দর্শন করবার জন্য।

আপনি ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিব পূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥ চৈঃ ভাঃ।

ভুবনেশ্বর ত্যাগ করে গৌরাঙ্গদেব মহানন্দে কীর্তন করতে করতে এগিয়ে গেলেন। মুখে তাঁর জগন্নাথের জয়গান। কোথায় জগন্নাথ…কত দূর জগন্নাথ! গৌরাঙ্গদেবের উৎকণ্ঠা যেন আরো বেড়ে গেল। এমনি করেই তিনি দলবল সহ পৌঁছে গেলেন কমলপুর[১৩]। দূর থেকে শ্রীদেউল-ধ্বজা দর্শন করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তারপর আঠারো নালা[১৪]…নীলাচলে প্রবেশ করেছেন গৌরাঙ্গদেব। দীর্ঘ পথযাত্রা…দীর্ঘ প্রতীক্ষা…এবার পথযাত্রার সমাপ্তি। নবদ্বীপ-শান্তিপুর… সেখান থেকে শুরু হয়েছিল পদযাত্রা, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, নানা বাধা, নানা বিপত্তি পেরিয়ে এসেছেন। পথ চলার সব বাধাই দূর হয়ে গেছে কৃষ্ণ গুণগান করতে করতে। পথিমধ্যে গ্রামে গ্রামে কীর্তন করেছেন। ভিক্ষা গ্রহণ করে রাত্রিবাস করেছেন দেবালয়ে, নয়তো পথের ধারে বৃক্ষতলে। পথ চলতে চলতে সমস্ত মানুষের সহানুভূতি, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা পেয়েছেন। সবার হৃদয় জয় করেছেন তিনি। সবাইকে কৃষ্ণকথা শুনিয়েছেন। সেই পথ সাধনার সমাপ্তি। নীলাচলে পথের ধূলার মধ্যেই গড়াগড়ি দিলেন গৌরাঙ্গদেব। জগন্নাথের নাম করে আকুল হয়ে ক্রন্দন করলেন। তাঁর আকুল প্রার্থনা, আর্তি লক্ষ্য করে নগরবাসীরা বিস্ময়ে অবাক হলো।

—কে এই তরুণ সন্ন্যাসী! এই নবীন বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে এসেছেন নীলাচলে! জগন্নাথের নাম করে এত প্রেম, এত আর্তি তো কেউ দেখেননি! এ তো সাধারণ সন্ন্যাসী নন। নিশ্চয়ই কোন অবতার পুরুষ। পথের ধারে সব নরনারী ভিড় করে দর্শন করলেন।

পথে যত দেখায় সুকৃতি নরগণ।
তারা বোলে এই তো সাক্ষাৎ নারায়ণ॥ চৈঃ ভাঃ।

গৌরাঙ্গদেব ধীরে ধীরে নিজেকে সম্বরণ করলেন। স্থির হয়ে তিনি বললেন ভক্তবৃন্দকে—

তোমরা তো আমার করিলা বন্ধু কাজ।
দেখাইলা আমি জগন্নাথ মহারাজ॥ চৈঃ ভাঃ

তোমাদের কৃপায় আমি নীলাচলে এসেছি। এবার জগন্নাথ দর্শন করে আমার

জীবন সার্থক হবে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জগন্নাথ দর্শনের জন্য আমার মনপ্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে। আমি জগন্নাথ দর্শন করবো কখন? গৌরাঙ্গদেবের মানসিক অবস্থা অনুভব করে মুকুন্দ বললেন—তুমি জগন্নাথ দর্শনের জন্য ব্যাকুল। তুমিই আগে জগন্নাথ দর্শন করো। তারপর আমরা যাবো দর্শন করবার জন্য।

ভক্তবৃন্দের আদেশ পেয়ে গৌরাঙ্গদেব মত্ত সিংহের মতো দ্রুত বেগে এগিয়ে গেলেন মন্দিরের দিকে। সিংহদ্বার অতিক্রম করে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করে প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষা, জগন্নাথ দৃষ্টিপথে আসতেই আত্মহারা হয়ে গেলেন। এই সেই জগন্নাথ, তাঁর হৃদয়ের প্রভু! মুহূর্তের মধ্যে অদ্ভুত ভাবাবেশে বিভোর হয়ে গেলেন। হুঙ্কার করে ছুটে এগিয়ে গেলেন জগন্নাথের দিকে। ঠিক সেই সময় হৈ হৈ করে এগিয়ে এলো ছড়িদার আর জগন্নাথের দ্বার-রক্ষীর দল। ঠিক এই সময় নীলাচলের সর্বজনপূজিত পরম পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য মন্দিরে প্রবেশ করছিলেন জগন্নাথ দর্শন করবার জন্য। সার্বভৌম লক্ষ্য করলেন, একজন তরুণ সন্ন্যাসী জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম দর্শনমাত্র দ্রুত বেগে ধেয়ে গেলেন মূর্তির পাদদেশে। তারপর হুঙ্কার করে যেন লাফ দিয়ে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করবার চেষ্টা করলেন। তাঁর দু চোখ বেয়ে অবিরল জলধারা, তাঁর মুখে এক অদ্ভুত স্বর্গীয় আভা! তরুণ সন্ন্যাসী লাফ দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেও পারলেন না। আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন মূর্তির পাদদেশে। মূর্ছিত হয়ে গেলেন তিনি। অজ্ঞ ছড়িদার গৌরাঙ্গদেবের অচেতন দেহে ছড়ি দিয়ে আঘাত করবার পূর্বেই সার্বভৌম এগিয়ে গেলেন দ্রুত বেগে। অবাক হয়ে দেখলেন, গৌরাঙ্গদেবের অচেতন দেহ। বিস্মিত হয়ে ভাবলেন—এ কি অদ্ভুত দৃশ্য! এমন দৃশ্য তিনি কখনো দেখেননি! এ তো সাধারণ সন্ন্যাসী নয়! পুরীর মন্দিরে অনেক সন্ন্যাসী আসেন দেশ-দেশান্তর থেকে জগন্নাথ দর্শন করবার জন্য। কিন্তু এমন সন্ন্যাসী তো দেখা যায় না! সার্বভৌম বাধা দিলেন ছড়িদারদের। ছড়িদারগণ সার্বভৌমকে দেখেই নিরস্ত হল।

উৎকল দেশের রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের সভাপণ্ডিত সার্বভৌম। ন্যায় শাস্ত্রে বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। গৌড় দেশে সে সময় ন্যায় শাস্ত্রে সুপণ্ডিতের অভাব ছিল। তাই সার্বভৌম নবদ্বীপ থেকে গিয়েছিলেন মিথিলায় ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্য। সেখানে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ন্যায় শাস্ত্রের অতি মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পুঁথি নকল করে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার চেষ্টা করতেই চতুষ্পাঠির অধ্যাপকগণ প্রচণ্ড বাধা দিয়ে-ছিলেন। সার্বভৌমের অসাধারণ ধী-শক্তি, তিনি ন্যায় শাস্ত্রের দুষ্প্রাপ্য সমস্ত গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে চলে এসেছিলেন মিথিলা থেকে। মায়াবাদী বিশ্বাসী, ন্যায় শাস্ত্রে, বেদান্ত

শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। ন্যায় শাস্ত্র পাঠ করান তরুণ ছাত্রদের। সন্ন্যাসীদের বেদ-বেদান্ত শ্রবণ করান। ভক্তিবাদে আদৌ বিশ্বাসী নন। বরং ভক্তিবাদীদের কূটতর্কে ভক্তিবাদ নিরসন করবার চেষ্টা করেন। এই সেই অসাধারণ পণ্ডিত সার্বভৌম। অচেতন গৌরাঙ্গদেবকে ভালভাবে দর্শন করে বিস্মিত হলেন। সত্যি সত্যি এ তো সাধারণ সন্ন্যাসী নন!

এ হুঙ্কার, এ গর্জন, এ প্রেমের ধার।
যত অলৌকিক শক্তির প্রচার॥ চৈঃ চঃ।

এই তরুণ সন্ন্যাসীর দেহে অদ্ভুত প্রেমের বিকার। এমন প্রেমের বিকার তিনি কখনো দেখেননি। এই তরুণ সন্ন্যাসীর দেহের ওপরে নির্যাতন হতে পারে এই আশঙ্কা করে ছড়িদারদের সাহায্যে গৌরাঙ্গদেবের অচেতন দেহ বয়ে নেওয়া হল পণ্ডিত সার্বভৌমের গৃহে। সার্বভৌম ছড়িদারদের বললেন—এই সন্ন্যাসী সাধারণ নন। হয়তো কোন মহাপুরুষ!

সার্বভৌমের গৃহে পবিত্র স্থানে শোয়ানো হল গৌরাঙ্গদেবের অচেতন দেহ। সবাই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকালো। সার্বভৌম লক্ষ্য করলেন—গৌরাঙ্গের দেহে স্পন্দন নেই, শ্বাস নেই, অর্ধনিমীলিত আয়ত নয়ন যুগল।

শ্বাস প্রশ্বাস নাহি উদর স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্যের মন॥
সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা আগেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখে ধৈর্য হৈল॥ চৈঃ চঃ।

ভক্তিবাদে বিরোধী হলেও সিদ্ধপুরুষের ভক্তি-প্রেমের বিকার-চিহ্ন সার্বভৌমের জানা। এই তরুণ সন্ন্যাসী যথার্থই সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু এমন নবীন বয়সে সাধনার এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে সিদ্ধিলাভ করবার দৃষ্টান্ত তো দেখা যায় না। এ যে অসম্ভব বলে মনে হয়। একমাত্র নিত্যসিদ্ধ পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। ইনি কি যথার্থই নিত্যসিদ্ধ?

বসি ভট্টাচার্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রণয়।
নিত্য সিদ্ধ ভক্তে সুদীপ্ত ভাব হয় ॥
অধিরূঢ় মহাভাব তার এ বিকার।
মানুষের দেহে দেখি বড় চমৎকার ॥

সার্বভৌম বিহ্বল হলেন। এই তরুণ সন্ন্যাসীর দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। ভক্তিবাদী সাধকরা ঈশ্বরের নাম গান করতে করতে তাঁদের চিত্ত সত্ত্বভাবের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। তখন তাঁদের দেহমনের মধ্যে শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার দেখতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের নামগান করলে, শুনলে, মন্দিরে মূর্তির দর্শন লাভ করলেই সাধকের দেহে আটটি সাত্ত্বিক বিকারের প্রকাশ পায়। এইগুলি স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু বা কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রণয়। এই সব বিকারগুলির এক একটি দেহে প্রকাশ পায় পর্যায়ক্রমে। দেহ বিকারের চরম অবস্থায় প্রকাশ পায় মূর্ছা বা প্রণয়। দীর্ঘ সাধনায় সাধনার শেষ অবস্থা মহাভাব। শাস্ত্রে আছে—

মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী ॥

এই মহাভাবের অধিকার কি করে পেলেন এই তরুণ সন্ন্যাসী? একমাত্র অবতার পুরুষ এই মহাভাবের অধিকারী। তবে কি…এই তরুণ সন্ন্যাসী অবতার পুরুষ?

সার্বভৌম চমৎকৃত হলেন। কেমন যেন সংশয়! এই মহাভাবের চিহ্ন এই তরুণ সন্ন্যাসীর দেহে কি করে বিকশিত হল? কতই বা বয়স, কত কালই বা সাধনা করেছে? সারাজীবন সাধনা করলেও বহু সাধকের দেহে অষ্ট সাত্ত্বিকের বিকার প্রকাশিত হয় না। আর এই তরুণ সন্ন্যাসীর দেহে এই সব চিহ্ন! বাহ্যজ্ঞান হয়নি গৌরাঙ্গদেবের। অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত সার্বভৌম বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এই তরুণ ভক্তিবাদী সন্ন্যাসী শুধুমাত্র নামগান করেই সাধন-মার্গের এমন চরম অবস্থায় উন্নীত হলেন কেমন করে? বার বার ভাবলেন সার্বভৌম…এ নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ! মহাপুরুষ বললেও হয়তো ঠিক হবে না। তবে কি অবতার পুরুষ? দেহলক্ষণ—শাস্ত্রগত সব চিহ্ন পর্যবেক্ষণ করলেন সার্বভৌম পণ্ডিত। বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যেন। লক্ষণগুলির সঙ্গে শাস্ত্রে উল্লিখিত লক্ষণগুলোর পর্যালোচনা করলেন। তবু বিচার করতে হবে, সামান্য সংশয় থাকলে চলবে না।

অপর দিকে নিত্যানন্দ সহ অন্যান্য ভক্তগণ বিলম্ব লক্ষ্য করে সিংহদ্বারে এসে

সমবেত হলেন। মন্দিরের ভেতরের সমস্ত যাত্রী আর জগন্নাথের ছড়িদারদের মুখে বলাবলি শোনা যাচ্ছিল। কোন এক নবীন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে মূর্ছিত হয়েছেন। আর চেতনা না আসায় সার্বভৌম তাঁকে তাঁর গৃহে নিয়ে গেছেন। নিত্যানন্দ শুনে বুঝলেন—এ একমাত্র গৌরাঙ্গদেবের লীলা।

ঠিক এই সময় নদীয়াবাসী গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে দেখা হল নিত্যানন্দ ও তাঁর সঙ্গীদের। সার্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য। তিনি গৌরাঙ্গদেব সম্পর্কে সবিশেষ জানতেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ সবাইকে গোপীনাথ আচার্য আলিঙ্গন করলেন। মুকুন্দ কুশল জানিয়ে বললেন গৌরাঙ্গদেবের কথা।

মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সবা লইঞা — চৈঃ চঃ।

তারপর ভক্তদের ছেড়ে গৌরাঙ্গদেব গিয়েছেন জগন্নাথ দর্শন করবার আশায়। এখানে তাকে দেখতে না পেয়ে আমরা সবাই অন্বেষণে বেরিয়েছি।

আমা সবা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে।
আমি সব পাছে আইলাম তাঁর অন্বেষণে॥
অন্যান্য লোকের মুখে যে কথা শুনিলা।
সার্বভৌম গৃহে প্রভু অনুমান কৈল॥
ঈশ্বর দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্বভৌম লাঞা গেলা আপন ভবনে॥ — চৈঃ চঃ।

গোপীনাথ আচার্য পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞ। গৌরাঙ্গদেবের সম্পর্কে সব কথা শুনে ভক্তদের নিয়ে গেলেন সার্বভৌমের গৃহে। সেখানে অচেতন গৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করলেন সবাই। ধূলি-ধূসরিত দেহ, মলিন জীর্ণ বস্ত্র। গৌরাঙ্গদেবের অবস্থা দর্শন করে আচার্যের দুঃখ ও আনন্দ হল। এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় আনন্দ হল গোপীনাথ আচার্যের। এ কি অদ্ভুত দৃশ্য…এ যে ধ্যানমূর্ছা! সারাজীবন কঠোর সাধনায় যা লাভ করা যায় না, এই তরুণ সন্ন্যাসী উচ্চ অবস্থা লাভ করেছেন। গোপীনাথের দেহে অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগলো। দু চোখ জলে ভেসে গেলো।

আত্মস্থ হয়ে আচার্য সার্বভৌমের সঙ্গে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও অন্যান্য

সবাই-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা পরস্পর প্রীতি বিনিময় করলেন। সবার পরিচয় পেয়ে সার্বভৌম বললেন—তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় খুশী হলাম। চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। তোমাদের প্রভুকে আমরা দেখাশুনা করছি। তোমরা তো কেউ জগন্নাথ দর্শন করনি?

সার্বভৌম তাঁর পুত্র চন্দ্রেশ্বরকে পাঠালেন নিত্যানন্দ মুকুন্দ ও আর আর ভক্তদের জগন্নাথ দর্শন করাবার জন্য। মন্দিরে প্রবেশ করে জগন্নাথ দর্শন করলেন সবাই। জগন্নাথ দর্শন করে নিত্যানন্দ প্রেমে আবিষ্ট হলেন। ভক্তগণ তাঁকে সুস্থির করলেন। জগন্নাথের সেবকেরা সবার প্রেম দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে সবার গলায় পরিয়ে দিল প্রসাদী মালা। তারপর নিত্যানন্দ ভক্তবৃন্দ সহ পৌঁছে গেলেন সার্বভৌমের গৃহে। সেখানে গৌরাঙ্গদেবের অচেতন দেহকে বেষ্টন করে উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীর্তন শুরু করলেন। তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হবার পর গৌরাঙ্গদেবের চেতনা হল। চেতনা হতেই গৌরাঙ্গদেব উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি ধ্বনি করে হুঙ্কার দিলেন।

হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বুলে।
আনন্দে সার্বভৌম তাঁর লৈলা পদধূলি — চৈঃ চঃ।

জ্ঞান হতেই অবাক হয়ে তাকালেন গৌরাঙ্গদেব। স্থির হয়েই—সামনে নিত্যানন্দকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—

কহ দেখি আজি মোর কোন বিবরণে — চৈঃ ভাঃ

নিত্যানন্দ বললেন—তুমি মন্দিরে প্রবেশ করে জগন্নাথ দর্শন করবামাত্রই মূর্ছিত হয়েছিলে। ভাগ্যক্রমে সার্বভৌম সেই স্থানেই ছিলেন। তাই তোমার অবস্থা দেখে তোমাকে বহন করে নিয়ে এসেছেন নিজ গৃহে। প্রেমাবেশে মূর্ছা হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছিলে তুমি। তাই কিছুই জানতে পারনি। তিন প্রহর অতিক্রম হলেও তোমার জ্ঞান হয়নি। আমরা সবাই দারুণ চিন্তায় ছিলাম। গৌরাঙ্গদেব তাকালেন সার্বভৌমের দিকে। সার্বভৌম করজোড়ে নমস্কার করতেই গৌরাঙ্গদেব আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। তিনি বললেন—জগন্নাথ পরম কৃপাময়। আমাকে তোমার গৃহে নিয়ে এসেছেন কৃপা করে। আমি যে তোমারই সাক্ষাৎ মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম। কৃষ্ণ আমার সে ইচ্ছা পূরণ করেছেন।

সার্বভৌম আনন্দিত হলেন গৌরাঙ্গদেবের সহজ-সরল কথা শুনে। সবার দিকে তাকিয়ে গৌরাঙ্গদেব বললেন হাসিমুখে—

জগন্নাথ দেখি চিত্ত হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষমাঝে থুই আপনার॥
ধরিতে গেলাঙ্ মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥ চৈঃ ভাঃ।

গৌরাঙ্গদেব বললেন হাসিমুখে—দৈবে সার্বভৌম আমার পাশেই ছিলেন, নইলে কি বিপদই না হোত! এর পর থেকে আমার একাকী জগন্নাথ দর্শন আর হবে না।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—এর পর থেকে আমি বরং বাইরে গরুড় স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করবো।

বেলা দ্বিপ্রহর হতেই সার্বভৌম বললেন—মধ্যাহ্নকাল হয়েছে। আজ আমি তোমাদের জন্য মহাপ্রসাদ ভিক্ষা এনে দেবো। তোমরা যাও, স্নান সম্পন্ন কর।

গৌরাঙ্গদেব ভক্তদের নিয়ে সমুদ্রস্নান সমাপন করে চলে এলেন সার্বভৌমের গৃহে। সবাই আসনে উপবেশন করলে—সুবর্ণ থালায় উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জন সাজিয়ে সার্বভৌম স্বয়ং পরিবেশন করতে শুরু করলেন ভক্তিভরে। গৌরাঙ্গদেব বললেন—এই সব পিঠা, পানা সবাইকে দাও। আমার জন্য শুধু লাফ্‌রা ব্যঞ্জন দাও।

সার্বভৌম করজোড়ে বললেন—এ সবই জগন্নাথের মহাপ্রসাদ। জগন্নাথ কেমন ভোজন করেন প্রতিদিন, সেই মহাপ্রসাদ আস্বাদন করো।

ভোজন-পর্ব সম্পন্ন হল হরিধ্বনি দিয়ে। গোপীনাথ আচার্য গৌরাঙ্গদেবকে সার্বভৌমের সবিশেষ পরিচয় দিলেন। গৌরাঙ্গদেব 'নমো নারায়ণ' বলে নমস্কার করে বললেন—'কৃষ্ণে মতিরস্তু'।

সার্বভৌম সম্বোধন শুনে বুঝলেন—এ সন্ন্যাসী বৈষ্ণব, কৃষ্ণমন্ত্রি। এই সন্ন্যাসীর সম্পর্কে সবিশেষ জানা প্রয়োজন।

গোপীনাথ আচার্যকে অলক্ষ্যে জিজ্ঞাসা করলেন সার্বভৌম পণ্ডিত—তোমার এই তরুণ সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রম কোথায়?

গোপীনাথ জানালেন—এই তরুণ সন্ন্যাসীর ঘর নবদ্বীপে।

—নবদ্বীপ! সার্বভৌম অবাক হলেন।

গোপীনাথ বললেন—নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর।

আত্মীয়-পরিচয় জেনে খুশী হলেন সার্বভৌম। গৌরাঙ্গদেবকে তিনি বললেন—তুমি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী সহজেই সবার পূজ্য। আমি তাই তোমার দাস।

গৌরাঙ্গদেব লজ্জা পেয়ে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে বললেন সার্বভৌমকে—আমি তোমার পরিচয় পেয়েছি। তুমি তো জগৎগুরু। সর্বলোকহিত কল্যাণে বেদান্ত পাঠ করে শোনাও সবাইকে। তুমি সন্ন্যাসীদের বেদান্ত শ্রবণ করাও।

গৌরাঙ্গদেব করজোড়ে বললেন—

আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি॥
তোমার সহ লাগি মোর ইহা আগমন।
সর্ব প্রকারে করিবে আমায় পালন॥ চৈঃ চঃ।

সার্বভৌম একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে। সন্ন্যাসী কি যেন বলতে চান! কি যেন এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত! সত্যিই কি আমার জন্য এই তরুণ সন্ন্যাসী সুদূর নবদ্বীপ থেকে এসেছেন নীলাচলে! আমার সঙ্গ লাভের জন্য এসেছেন এই নবীন সন্ন্যাসী! কি উদ্দেশ্য? ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, সর্বাঙ্গে তাঁর অদ্ভুত চিহ্ন। তাঁর দেহ-সৌষ্ঠভ, সুললিত কণ্ঠ, এমন সহজ সারল্য…এমন বিনয়! সার্বভৌম যেন বিভ্রান্ত হয়েছেন। তিনি যে উৎকল দেশের রাজার সভাপণ্ডিত। আমি নানা শাস্ত্র পাঠ করেছি। বেদ, বেদান্ত, ন্যায় শাস্ত্র সবই নখদর্পণে—আমি যে মায়াবাদী। সমস্ত উৎকল দেশ আমাকে সস্নেহ ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। নবদ্বীপের এই তরুণ সন্ন্যাসী এসেছেন আমার আলয়ে…আমার আশ্রয়ে। সন্ন্যাসী তো অকপটে বলেছেন—

সর্ব প্রকারে করিবে আমায় পালন।

অকপট আত্মসমর্পণ। শিশুর মতো সহজ ও সরল এই সন্ন্যাসী। সার্বভৌম আরো বিস্মিত হলেন। সন্ন্যাসীর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন বোধ করলেন তিনি।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—তুমি আমাকে না দেখলে, আমার নানা বিপত্তি থেকে কে অব্যাহতি দেবে? মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়েই যা বিপত্তি হয়েছিল—

আজি যে হইল আমায় বড়ই বিপত্তি।
তাহাতে করিলা তুমি আমার অব্যাহতি॥ চৈঃ চঃ।

সহজ সরল কথা। সার্বভৌম বললেন—আজ থেকে তুমি কখনো একাকী মন্দিরে যাবে না। মন্দিরে হয় আমার সঙ্গে যাবে জগন্নাথ দর্শন করবার জন্য, না হয় তোমার ভক্তদের সঙ্গে যাবে।

গোপীনাথ আচার্যকে বললেন সার্বভৌম—তুমি নিজে গোসাঞিকে নিয়ে জগন্নাথ দর্শন করাবে। আমার মাসীর বাড়িতে বেশ নির্জন ঘর আছে। তরুণ নবীন সন্ন্যাসীর সেখানেই থাকবার ব্যবস্থা করবে।

একদিন গৌরাঙ্গদেবকে অতি প্রত্যুষে গোপীনাথ নিয়ে গেলেন মন্দিরে। জগন্নাথ প্রভুর শয্যোত্থান দর্শন করালেন তিনি।

সন্ধ্যায় ভোগ-আরতি হবার পর রাত্রে দেবতাদের শয়ন হয়। আবার অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ; জগন্নাথের শয্যোত্থান অনুষ্ঠান দর্শন করে গৌরাঙ্গদেব মুগ্ধ হলেন। তারপর সেখান থেকে গৌরাঙ্গদেবকে গৃহে পৌঁছে দিয়ে মুকুন্দ দত্ত ও গোপীনাথ গেলেন সার্বভৌমের গৃহে।

সার্বভৌম আকৃষ্ট হয়েছেন গৌরাঙ্গদেবকে প্রথম দর্শনেই। কেমন যেন প্রীতির সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন সার্বভৌম—কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, এই তরুণ সন্ন্যাসীর নামই বা কি?

গোপীনাথ বললেন—

গোপীনাথ কহে—নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
গুরু ইহার নাম কেশব ভারতী মহাধন্য॥ চৈঃ চঃ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম সর্বোত্তম। সার্বভৌম সহাস্যে বললেন—তবে সম্প্রদায় কিন্তু উত্তম নয়। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতী মধ্যম।

গৌরাঙ্গদেব সম্পর্কে বিচার গোপীনাথের মনঃপূত হচ্ছিল না। তাই বললেন—এ সবই বাহ্য। সম্প্রদায় বা অন্য কিছু সবই বাহ্য।

সার্বভৌম হাসলেন—তোমার সন্ন্যাসী তো বয়সে তরুণ। মাত্র অল্পকাল আগে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছেন। সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেই—আত্মীয়-পরিজন ত্যাগ করে চলে এসেছেন নীলাচলে। সবই ঠিক, সবই যথার্থ।

গোপীনাথ আচার্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকালেন সার্বভৌমের দিকে। সার্বভৌমের চোখে যেন এক অদ্ভুত দৃষ্টি। সার্বভৌম বললেন—তোমার নবীন সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য কতটা তীব্র, এই তীব্রতা নিরূপণ করবার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষার প্রশ্ন উঠবে।

গোপীনাথ বিব্রত হলেন সার্বভৌমের কথায়। গৌরাঙ্গ সম্পর্কে এসব কি ধরনের প্রশ্ন?

সার্বভৌম আশ্বাস দিলেন—চিন্তার কারণ নেই আচার্য। সন্ন্যাসী তো আমার কাছে বলেছেনই—আমার কাছে সাহায্য চেয়েছেন। আমি ওঁকে বেদান্ত পাঠ করে শ্রবণ করাবো। নিরন্তর বেদান্ত শ্রবণ করলে মনে কখনো চাঞ্চল্য আসবে না। যথার্থ বৈরাগ্য স্থায়ী হবে। পরে অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করিয়ে নতুন ভাবে সংস্কার এনে উত্তম সম্প্রদায়ে উন্নীত করা যাবে।

গোপীনাথ দুঃখিত হলেন সার্বভৌমের কথা শুনে। অবশ্য পণ্ডিতের কাছ থেকে এ ছাড়া অন্য কিছুই আশা করা যায় না। বৈদান্তিক পণ্ডিত। শিষ্য পরিবেশে অবস্থান করে সর্বদা ন্যায় শাস্ত্র মীমাংসা নিয়েই দিনরাত অতিবাহিত করেন। নীরস শাস্ত্র আলোচনায় ব্যস্ত সার্বভৌম ভক্তিযোগ সম্পর্কে কোন আস্থাই পোষণ করেন না। তাই গৌরাঙ্গদেবকে একজন অত্যন্ত সামান্য সাধারণ সন্ন্যাসী মনে করেছেন। ভেবেছেন—এ তরুণ সন্ন্যাসী যথার্থ বৈরাগ্য না আসতেই, সংসার ত্যাগ করে অবিবেচকের মতো সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছেন। গৌরাঙ্গদেবকে অত্যন্ত সাধারণ ভাবে বিচার করায় ক্ষুব্ধ হয়ে গোপীনাথ আচার্য বললেন—

> ভট্টাচার্য তুমি ইহার না জান মহিমা।
> ভগবত্তা লক্ষণের ইহাতেই সীমা॥
> তাহাতে বিখ্যাত ইহোঁ পরম ঈশ্বর।
> অজ্ঞস্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর॥ চৈঃ চঃ।

সার্বভৌম, তুমি এই নবীন সন্ন্যাসী সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারলে না। তাঁর ব্যবহার, আকৃতি, প্রকৃতি দেখেও বিচার করতে পারলে না। এই তরুণ সন্ন্যাসীর দেহেই ভগবত্তার চরম বিকাশ দেখতে পেয়েও তুমি মানতে পারো না। তুমি জানো না…ইনি স্বয়ং ভগবান। ঈশ্বরত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ তাঁর দেহে। অজ্ঞ লোকেরা এ সব বিশ্বাস করবে না, বরং উপহাস করবে। কিন্তু যথার্থ বিজ্ঞ জনই অনুভব করতে

পারবেন। গোপীনাথের কথা শুনে সার্বভৌমের শিষ্যদল কোলাহল করে উঠল উপহাস করে। তারা জিজ্ঞাসা করলো—ঐ তরুণ সন্ন্যাসীর আচার-ব্যবহারে ঈশ্বরত্বের কি প্রকাশ পেয়েছে? তাঁকে ঈশ্বর বলা হবে কেন? ঈশ্বরত্বের কি প্রমাণ রয়েছে বল?

গোপীনাথ আচার্য হাসলেন শিষ্যদের উপহাসে। সার্বভৌমের দিকে তাকিয়ে বললেন—যাঁরা বিজ্ঞ, যাঁরা তত্ত্ব-বিশারদ, শুধু তাঁরাই এই লক্ষণ অনুভব করতে পারবেন। তাঁরা অনুভবের ভেতর দিয়েই প্রমাণ পান। তোমার শিষ্যগণ তো মায়া-বাদী-বৈদান্তিক। তারা তো তোমারই শিষ্য। তারা ঈশ্বর-তত্ত্বের প্রমাণ পাবে কি করে? তোমরা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হলে যথার্থ কোন তত্ত্বই শুধুমাত্র অনুমান করে মেনে নিতে পারো না।

আচার্য অবিচল তাঁর দেহে, মনে, চিন্তায় আর কথায়। তিনি বললেন—ঈশ্বর-জ্ঞান যথার্থই অনুমানের দ্বারা লাভ করা যায় না। ঈশ্বর যদি কৃপা করেন তা হলেই এই জ্ঞান লাভ করা যায়।

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়তো যাঁহার।
সেই তো ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥ চৈঃ চঃ।

গোপীনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—সার্বভৌম, তুমি জগদ্‌গুরু হতে পারো! সর্ব শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞানবান হতে পারো! পৃথিবীতে তোমার তুল্য পণ্ডিত হয়তো নেই! তবু ঈশ্বরের কৃপালেশ তোমাতে বিন্দুমাত্র নেই বলেই ঈশ্বরতত্ত্ব তুমি বুঝতে পারো না। শাস্ত্রে এই কথাই বলে—অবিদ্যার দ্বারা আবিষ্ট হলে…মায়া দ্বারা আবৃত থাকলে নিজেকেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। তাঁর পক্ষে ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভব করা সম্ভব হয় না।

সার্বভৌম গোপীনাথ আচার্যের যুক্তিতর্ক শুনে হাসলেন। তাঁর মনে আঘাত লেগেছে হয়তো। বুঝলেন সার্বভৌম; তরুণ সন্ন্যাসীকে শ্রেষ্ঠের আসনে বসিয়েছেন গোপীনাথ আচার্য। বিচার করেছেন কি—সন্ন্যাসীর সঙ্গে সামান্য পরিচয়েই?

সার্বভৌম বললেন—তুমি ঈশ্বরের কৃপা বলতে কি বোঝাতে চাও?

গোপীনাথ আচার্য বললেন—কোন বস্তু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাকেই বস্তুজ্ঞান বলা যায়। কিন্তু বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। সে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়া আলাদা।

আচার্য কহে বস্তু বিষয়ে হয় বস্তুজ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ॥

গোপীনাথ আচার্যও সুপণ্ডিত। নানা শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। গৌরাঙ্গদেবকে সাধারণ সন্ন্যাসীর পর্যয়ে পংক্তিভুক্ত করার ইঙ্গিত তিনি সহ্য করতে পারলেন না। জগন্নাথ প্রভুর দর্শনে যাঁর ধ্যানমূর্ছা হয়, যে আর্তি, যে ব্যাকুলতা কৃষ্ণনামে, কৃষ্ণনামে যাঁর দু নয়নের জল শুকোয় না, তিনি তো সাধারণ কখনই নন। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে সাধারণ সাধক সাধনার চরম পর্যায়ে পৌঁছে যেতেই পারেন না। দীর্ঘকাল কঠোর সাধনার কোন প্রমাণ নেই গৌরাঙ্গদেবের। তাই তো গৌরাঙ্গদেব নিত্যসিদ্ধ। প্রথম দর্শনেই গোপীনাথের হৃদয় ভরে গেছে। পরম ভক্ত হয়েছেন—তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে। ভক্তিযোগ সাধনায় চরম সিদ্ধি…আর সেই সিদ্ধিলাভের পূর্ণ প্রকাশ গৌরাঙ্গদেবের দেহে ও মনে।

তাই গোপীনাথ আচার্য বললেন সার্বভৌমকে—

ইহার শরীরে সব ঈশ্বর লক্ষণ।
মহা প্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন॥ চৈঃ চঃ।

দুঃখ প্রকাশ করে গোপীনাথ বললেন সার্বভৌমকে—

তবু তো ঈশ্বর জ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরের মায়া এই বলি ব্যবহার॥ চৈঃ চঃ।

সার্বভৌম মায়াবাদী—অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী পণ্ডিত—ভক্তিযোগে বিশ্বাসী হবেন কি করে? অথচ গৌরাঙ্গদেব সুদূর নীলাচলে এসেছেন ভক্তিযোগের জোয়ার বয়ে এনে। এই ভক্তিযোগ উৎকলে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রধান অন্তরায় সার্বভৌম পণ্ডিত। সার্বভৌম এই ভক্তিযোগে বিশ্বাসী হলে সমস্ত উৎকলবাসীই নাম সংকীর্তনে দীক্ষিত হবে। গৌরাঙ্গদেব ইঙ্গিতে এ কথা বলেছেন—তিনি সার্বভৌমের কাছেই তো এসেছেন। জগন্নাথ দর্শন তাঁর অন্তরের বাসনা, সার্বভৌমের কাছে এসে তাঁর আপনজন হলেই সব আশা পূরণ হবে।

গোপীনাথের সমস্ত যুক্তি তর্ক মেনে নিতে পারলেন না সার্বভৌম। তিনি যে:

শাস্ত্রজ্ঞ, ঈশ্বরতত্ত্বের প্রমাণ শাস্ত্রে কোথায় রয়েছে? গোপীনাথের বিশ্বাসী মন, তাই সহজেই গৌরাঙ্গদেবকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। ভক্ত হয়েছেন, ভক্ত প্রভুকে সর্বদাই উচ্চাসনে বসাতে চান। সার্বভৌম তাই গোপীনাথকে বললেন—

ইষ্টিগোষ্ঠি বিচার করি না করিহ রোষ।
শাস্ত্রে দৃষ্টে কহি কিছু না লইহ দোষ॥ চৈঃ চঃ।

তুমি রুষ্ট হ'য়ো না আচার্য। আমি শাস্ত্রের বাইরে কিছুই বলছি না। এ তোমার দোষ নয়। চৈতন্যদেব মহাভাগবত হতে পারেন। কিন্তু তিনি অবতার-পুরুষ নন। কলি যুগে বিষ্ণু অবতারের উল্লেখ নেই।

মহাভাগবত হয় চৈতন্য গোসাঞি।
এই কলিযুগে বিষ্ণু অবতার নাই॥ চৈঃ চঃ।

সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, আর দ্বাপর যুগে বিষ্ণু অবতারের উল্লেখ রয়েছে। তিন যুগে বিষ্ণুর অবতার হয়েছে বলেই বিষ্ণুর আর এক নাম ত্রিগুণ। কাজেই কলি যুগে চৈতন্য অবতার অবাস্তব চিন্তা। তবে চৈতন্য গোসাঞি সিদ্ধ পুরুষ, মহাভাগবত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গোপীনাথ নীরব হয়ে গেলেন। সার্বভৌমের বিচার শুনে মর্মাহত হয়েছেন তিনি। তবু সার্বভৌমকে বললেন, তুমি মহাপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ এই অভিমানেই তুমি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছো। সার্বভৌম, মহাভারত ও ভাগবত এই দুইটি শাস্ত্রের কথা তুমি ভুলে গেছো। সেই গ্রন্থেই কলিতে সাক্ষাৎ অবতারের কথা বলা হয়েছে। কলিকালে লীলাবতার না হতে পারে, কিন্তু যুগাবতার তো হতে পারে।

কলি কালে লীলাবতার না করে ভগবান।
অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম॥
প্রতি যুগে করেন কৃষ্ণ যুগ অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার॥ চৈঃ চঃ।

সার্বভৌম হাসলেন অবিশ্বাসের হাসি। গোপীনাথ বিরক্ত হলেন। সার্বভৌমের

দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি ? উর ভূমিতে বীজ বপন করা যেমন সবই নিষ্ফল হয় ঠিক তেমনি। তোমার অসাধারণ মনীষা রয়েছে। কিন্তু তোমার ভক্তি নেই বিন্দুমাত্র। তাই সবই অসার। তবে তোমার ওপরে কৃপা হলে তুমি নিজেই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে যেতে পারবে। তোমার শিষ্যরা কুতর্কী। কারণ তারাও তোমার মতো মায়ার প্রসাদে আচ্ছন্ন।

সার্বভৌম বললেন, ঠিক আছে। তুমি গিয়ে গোসাঞিকে আমার হয়ে নিমন্ত্রণ করবে। আমি তার সঙ্গে কথা বলবো।

প্রসাদ আনি তারে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা॥ চৈঃ চঃ।

কেমন যেন মানসিক অশান্তি আর বেদনা নিয়ে সার্বভৌমের গৃহ থেকে বেরিয়ে পড়লেন গোপীনাথ আর মুকুন্দ। গৌরাঙ্গদেব সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা, নানা সংশয়, ইঙ্গিত অসহ্য হয়েছিল দুজনের কাছেই। তবে ভট্টাচার্যের সঙ্গে গোপীনাথের বাদানুবাদ, সর্বশেষ সিদ্ধান্তে কিছুটা স্বস্তি পেলেন। গৌরাঙ্গদেবের সাক্ষাৎ করে গোপীনাথ ভট্টাচার্যের নামে নিমন্ত্রণ জানালেন। মুকুন্দ সার্বভৌমের সঙ্গে গোপী-নাথের বাদানুবাদের কথা বললেন বিস্তারিত ভাবে। ভট্টাচার্যের অবিশ্বাস, নানা সন্দেহ, সবই বললেন।

মুকুন্দ সহিত কহে ভট্টাচার্যের কথা।
ভট্টাচার্য নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যথা॥ চৈঃ চঃ

সব শুনে গৌরাঙ্গদেব হেসে বললেন, তোমরা দুঃখ পাও কেন ? সার্বভৌম পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি তো যথার্থই বলেছেন। আমি নবীন সন্ন্যাসী, কতটুকুই বা জানি এই জগৎসংসারের ? তিনি অভিজ্ঞ, সংসারী মানুষ, বাস্তব জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। বাৎসল্য আর করুণা বশেই তিনি আমার সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষা করতে সাহায্য করতে চান। এতে কোন দোষ নেই। এ জন্য তোমরা তাঁর দোষ দিও না।

তারপর একদিন গৌরাঙ্গদেব সার্বভৌমের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করে জগন্নাথ দর্শন করলেন। দর্শনান্তে সার্বভৌম তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজ গৃহে। তারপর আসনে বসিয়ে সার্বভৌম নিজে অন্য একটি আসনে বসলেন। দুজনেই তাকালেন দুজনের

দিকে। গৌরাঙ্গদেব হেসে বললেন—

জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি।
উদ্দেশ্য আমার মূল এথা আছ তুমি ॥
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা।
তুমি যে আমার বন্ধু চিন্তিবে সর্বথা ॥ চৈঃ চঃ

সার্বভৌম অবাক হলেন। গৌরাঙ্গদেব হেসে বললেন, হ্যাঁ, সুদূর নবদ্বীপ-শান্তিপুর থেকে নীলাচলে এসেছি জগন্নাথ দর্শন করবার জন্য। জগন্নাথ আমার প্রভু, তাঁকে দর্শন করেই আমি কৃতার্থ। তাঁর সঙ্গে আমি কি কথা বলবো। কিন্তু নীলাচলে আসবার আর একটি উদ্দেশ্য—তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে। তোমাকেই তো আমার কথা বলতে পারবো। তুমি আমার সব বন্ধন-মুক্তির পথের কথা বলবে।

গৌরাঙ্গদেবের সারল্য, অকপট বক্তব্য অবিশ্বাস করতে পারলেন না সার্বভৌম।

গৌরাঙ্গদেব বললেন, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি। তুমি আমার জন্য যা ভাল বোঝো তাই করবে। আমি নবীন সন্ন্যাসী, আমার কর্তব্য, আমার আচরণ-বিধি, তোমার নির্দেশ নিয়ে আমি চলবো, যাতে সংসার ত্যাগ করে এখানে এসে আবার যেন নতুন করে সংসার-কূপে পড়ে না যাই।

সার্বভৌম গৌরাঙ্গদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি আমাকে যথার্থই ভালোবাসো তাই এসব কথা বলছো। তোমার ভেতরে যে ভক্তির উদয় হয়েছে, সে যথার্থ ও অপূর্ব। তোমার ওপরে নিশ্চিত কৃষ্ণের কৃপা বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর তুমি আমাকে দাও।

গৌরাঙ্গদেব মৃদু হাসি হেসে তাকিয়ে রইলেন সার্বভৌমের মুখের দিকে। সার্বভৌম বললেন, সংসার ত্যাগ করে কি হয়েছে তোমার? সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করবার প্রথমেই মিথ্যা অহঙ্কার-বন্ধনে বদ্ধ হতে হয়। দণ্ড ধারণ করে নিজেকে সাধারণের চাইতে আলাদা হয়ে মহাজ্ঞানী বলে মনে। কারো কাছে করজোড়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে হয় না। তিনি যে দণ্ডধারী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসের অহমিকা এসে ঘিরে থাকে সমস্ত দেহ মন। কারণ, যে মানুষ পরম শ্রদ্ধেয়, যার পদধূলি নেওয়া উচিত, সন্ন্যাসী তাঁর নমস্কার গ্রহণ করতে সঙ্কোচবোধ করে না।

সার্বভৌমের কথা শুনে গৌরাঙ্গদেব নীরবে হাসলেন। সার্বভৌম বললেন—সন্ন্যাসীর ধর্ম লেখা আছে ভাগবত গ্রন্থে।

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল, অন্তকরি
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্ত ধরি ॥
এই সে বৈষ্ণব ধর্ম সভারে প্রণতি।
সেই ধর্মধ্বজী যার ইথে নাহি রতি ॥ চৈঃ ভাঃ।

কিন্তু ধর্মধ্বজী সন্ন্যাসীর এসব কিছুই নেই। শিখা, সূত্র ঘুচিয়ে সন্ন্যাসী হন, সবার নমস্কার গ্রহণ করেন অকপটে। সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে আর কি সর্বনাশ হয় জানো ?

জীবের স্বভাবধর্ম ঈশ্বর ভজন।
তাহা ছাড়ি আপনাকে বোলে নারায়ণ ॥
গর্ভবাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধিজ্ঞান শিক্ষা ॥
* * *
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাঁহার দানে করে।
লাজো নাহি হেন প্রভু বোলে আপনারে ॥
নিদ্রা হৈলে আপনে কে ইহাও না জানে।
আপনারে নারায়ণ বোলে হেন জনে ॥ চৈঃ ভাঃ।

সার্বভৌম শ্রীমদ্ভাগবত গীতা থেকে উদ্ধৃত করে যথার্থ যোগীর লক্ষণ সম্পর্কে বললেন—

নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ ভজন।
তাহারে সে বলে যোগী সন্ন্যাসী লক্ষণ চৈঃ ভাঃ।

বিষ্ণুক্রিয়া না করিয়া পরান্ন খাইলে
কিছু নহে ; সাক্ষাতে এই বেদে বোলে ॥ চৈঃ ভাঃ

অথচ যোগী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে যোগীর কোন কার্য না করা যে কি অসৎ কার্য সে কথা বলা যায় না। জগতে ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন ভেদজ্ঞান নেই। কারণ,

ঈশ্বর সর্বময়, সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ সত্ত্বা। তিনি সর্বত্রই সর্ব অবস্থায় আছেন। আমি জানি, আমি তোমারই অধীন। হে ঈশ্বর, তোমা হতেই আমার সৃষ্টি। তোমা হতেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু তুমি আমার অধীন নও। অর্থাৎ আমা হতে ঈশ্বরের সৃষ্টি—এ কথা কখনো যথার্থ নয়। তরঙ্গ ও তরঙ্গময় সমুদ্রে পরস্পর পার্থক্য না থাকলেও এ কথা যথার্থ—যে সর্বলোকে সমুদ্রের তরঙ্গ বলে। কিন্তু কেউ তরঙ্গের সমুদ্র বলে না। শঙ্করাচার্যের শ্লোকে বলেন—

যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরের ভেদ নাঞি
সর্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব ঠাঞি ॥
তভো তোমা হইতে সে হইয়াছে আমি।
আমা হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি ॥
যেন সমুদ্রের সে তরঙ্গ লোকে বোলে।
তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোন কালে ॥

বিশ্ব জগৎ তোমার পিতা মাতা। ইহলোকে পরলোকে তুমি রক্ষিতা মাত্র। যে স্থান থেকে তোমার জন্ম, যে তোমারে পালন করে, তাঁকে ভজনা না করে বর্জন কর। এই সব জেনেও মাথা মুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে সর্বদা নিজেকে নারায়ণ বলা ভক্তিযোগের লক্ষণ নয়।

সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি নারায়ণ।
বলিবেক প্রেম ভক্তি যোগ অনুক্ষণ।
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায় ॥

সার্বভৌমের সমস্ত বক্তব্য শুনলেন গৌরাঙ্গদেব। নীরবে হাসলেন শুধু। সার্বভৌম বললেন, সবই তো শুনলে। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এ পথেঃ কেন এসেছ? যদি ভেবে থাকো কৃষ্ণ ভক্তিযোগে জগৎ উদ্ধার করবে! তবে শিখা, সূত্র ত্যাগ করলে কেন? অবশ্য মাধবেন্দ্র পুরী শিখা সূত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাঁর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের অধিকার ছিল। তিনি সংসারধর্ম পালন করবার পর উপযুক্ত বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তুমি? তুমি তো তরুণ। সংসার জীবন

সম্পর্কে কিছুই জানো না। এই যৌবনে প্রবেশ করে—সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের অধিকার তুমি কি করে পেয়েছো বল ?

গৌরাঙ্গদেব খুশী হলেন সার্বভৌমের বিচার শুনে। অত্যন্ত বিনয় সহকারে তিনি বললেন—তোমার সমস্ত কথাই শুনলাম। তুমি বিজ্ঞ, তাই তোমার কথা অস্বীকার করবো কেমন করে ? সন্ন্যাস গ্রহণে আমার অধিকার নাই। তবে—

কৃষ্ণ বিরহে মঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥ চৈঃ ভাঃ।

গৌরাঙ্গদেব বললেন বিনম্র কণ্ঠে—সার্বভৌম, আমি কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল হয়েছি, কৃষ্ণের বিরহে বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করবার জন্যই সংসার ত্যাগ করেছি, শিখা সূত্র ত্যাগ করে মাথা মুড়িয়ে এসেছি নীলাচলে। আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, অধিকারের কথা ভাবিনি। তাই সন্ন্যাস জ্ঞান করে তুমি আমায় কৃপা কর যাতে আমার কৃষ্ণে মতি হয়। তোমার কথায় আমি বুঝেছি—নিজে দাস হয়ে, প্রভু মনে করবার মায়ায় আমি আবদ্ধ ; এ কথা কেমন করে জানবো ? তুমিই আমাকে জানিয়েছো—মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাসী হওয়ায় অন্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে এ আমি ভাবতে পারি নি। আমি বুঝেছি, ঈশ্বর বিনা কার এত শক্তি, যিনি আমায় এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন ! আমি তো কিছুই জানি না। আমার সে শক্তিও নেই, আমি যে অজ্ঞ। অজ্ঞানতার জন্য সেবক যত কথাই বলুক, ঈশ্বর কিন্তু এতেও প্রীত হন। সর্বকালে ভৃত্যের সঙ্গে প্রভুর লীলাখেলা চলে। এই লীলার মধ্যেই ভৃত্য কিন্তু নানা বন্ধনে আবদ্ধ হলেও অনুভব করতে পারেন না। এই সেবকদের মুক্তির জন্যই তো অবতারের সৃষ্টি।

যে মতে সেবক ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেই মত দাস ভজেন আপনে॥
এই তাঁর স্বভাব যে সেবক বৎসল।
ইহা তাঁর নিবারিতে কার আছে বল॥ চৈঃ ভাঃ।

সার্বভৌম বললো—তুমি সন্ন্যাসী। আমি গৃহী, সংসারী মানুষ। তোমার আমার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। আশ্রমে তুমি অনেক বড়। শাস্ত্র মতে তুমি শ্রদ্ধেয়। তোমার বন্দনা আমি করবো। তার পরিবর্তে তুমি আমার স্তব করবে এ তো যুক্তিযুক্ত নয়। এতে অপরাধ হয়।

সহাস্যে গৌরাঙ্গদেব বললেন—আমি তোমার শরণ নিয়েছি। সন্ন্যাসী আমি, আমার ধর্ম তুমিই রাখবে।

এমনি দীর্ঘ বাক্যালাপের পর সার্বভৌম চিন্তা করে বললেন—সত্যি আমি তোমার মঙ্গল চাই। তাই বেদান্ত পাঠ করাবো তোমাকে। সন্ন্যাসীর বেদান্ত শ্রবণ করাই শ্রেয়।

বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥ চৈঃ চঃ।

অত্যন্ত বিনীত হয়ে গৌরাঙ্গদেব বললেন—তুমি অনুগ্রহ করে যা আমার কর্তব্য তাই করো।

সার্বভৌম বেদান্ত পাঠ করতে শুরু করলেন। প্রতিদিন নিয়মিত পাঠ করেন সার্বভৌম, গৌরাঙ্গদেব শ্রবণ করেন নীরবে। কোন প্রশ্ন নেই, কোন জিজ্ঞাস্য দৃষ্টি নেই। নীরব নিস্তব্ধ যেন, অথচ গভীর মনোযোগ। শ্রবণে বিরক্তি নেই, অবহেলা নেই, আলস্য নেই। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। এমনি করে কেটে যায় সাত দিন। শুধু নীরবে পাঠ শ্রবণ করলেন। অষ্টম দিনে সার্বভৌম বিস্মিত হলেন। কেমন যেন বিরক্তি প্রকাশ করেই জিজ্ঞাসা করলেন—সাত দিন ধরে তুমি বেদান্ত শ্রবণ করছো। আমি বেদান্তের জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছি। আমার ভাষ্য শ্রবণ করে কিছুই বলছো না। ভালোমন্দ—কিছুই তো তুমি বলো না, মৌন হয়ে শ্রবণ করো। আমি বুঝতে পারি না, জানতেও পারছি না···আমার বেদান্তভাষ্য তোমার বোধগম্য হল কিনা ?

গৌরাঙ্গদেব সবিনয়ে বললেন—আমি মূর্খ, আমার বিদ্যাবুদ্ধি খুবই সামান্য। তোমার আজ্ঞায় আমি বেদান্ত শ্রবণ করি মাত্র। তুমিই আমাকে আদেশ করেছো—সন্ন্যাসীর ধর্ম বেদান্ত পাঠ শ্রবণ করা। তোমার ব্যাখ্যা, তোমার ভাষ্য আমি শ্রবণ করি।

—সে কি! সার্বভৌম অবাক হয়ে বললেন—আমার বেদান্ত-ভাষ্য বুঝতে

পারো না ?

গৌরাঙ্গদেব হেসে বললেন—তোমার ব্যাখ্যা, ভাষ্য আমি ঠিক বুঝতে পারি না !

—বল কি ! সার্বভৌম বিরক্ত হয়ে বললেন—তুমি জ্ঞানবান বলেই মনে করি। বুদ্ধিমান বলেই মনে করি তোমাকে। আমার ব্যাখ্যা, ভাষ্য বোধগম্য না হলে তো বলবে, জিজ্ঞাসা করবে জটিল মনে হলে। কিন্তু তুমি শুধু নীরব হয়ে শ্রবণ করেছো। মৌন হয়ে শ্রবণ করা···তোমার মনে কি আছে বুঝতে পারি না !

গৌরাঙ্গদেব বললেন—বেদান্তসূত্রের দুরূহ ও জটিল তত্ত্ব সহজ সরল করে সবার বোধগম্য করাই তো ভাষ্যকারের প্রধান কর্তব্য।

—আমি তো তাই মনে করি। সার্বভৌম বললেন।

—বেদান্তসূত্রের অর্থ সহজ ও নির্মল। কিন্তু তোমার ব্যাখ্যা আমার মনে নানা সংশয় নিয়ে এসেছে। তুমি সূত্রের ভাষ্যকার, ভাষ্যই এমন যাতে সূত্রের মুখ্য অর্থই নানা জটিলতায় আচ্ছাদিত হয়েছে। ফলে সূত্রের মূল অর্থের ব্যাখ্যা হয়নি। কল্পনার্থ আচ্ছাদিত করে রেখেছে মূল ব্যাখ্যা। তুমি মুখ্য অর্থ পরিহার করে কষ্টকল্প গৌণার্থ করো।

ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন ॥ চৈঃ চঃ।

সার্বভৌম যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সত্যই, বেদান্তসূত্রের অর্থকে শঙ্করাচার্য অন্যরূপ ভাষ্য করেছেন। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের সাহায্যে মূল বেদান্তসূত্র ব্যাখ্যা করেছো তুমি। ফলে প্রাঞ্জল অর্থ বিকৃত হয়েছে।

বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপম।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বরলক্ষণ ॥ চৈঃ চঃ।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—বেদ পুরাণে ব্রহ্ম নিরূপম হয়েছে। ব্রহ্মের স্বরূপ কি, ব্রহ্মের অর্থ কি এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বৃহৎ···, সর্ববৃহৎ তাই বৃহত্তম। ব্রহ্ম বৃহত্তম তাই সর্বশক্তিমান। এই সবই কিন্তু গুণ! ব্রহ্মের এই সব গুণ বর্তমান বলে ব্রহ্ম

সগুণ। ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান বলেই তাঁর বৈভব আছে। বৈভবের আবার প্রকাশ আছে। এই প্রকাশই তাঁর ঐশ্বর্য। ব্রহ্ম তাই ঐশ্বর্যবান। সুতরাং ব্রহ্ম বৃহত্তম, সর্বশক্তিমান, সগুণ, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ। এই ব্রহ্ম নিরাকার হবেন কেন?

সার্বভৌম নীরব হলেন। গৌরাঙ্গদেব বললেন—সার্বভৌম, তুমি সর্ববিদ্যায় বিশারদ, তুমি কিনা ব্রহ্মকে নিরাকার বলে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করো! তোমার এই ব্যাখ্যায় আমি তাই বিভ্রান্ত হয়েছি।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—দেখো, শ্রুতিও ব্রহ্মকে নিরাকার বলতে গিয়েও দ্বিধা-গ্রস্ত হয়েছে। ব্রহ্মের হস্ত নেই, পদ নেই, চক্ষু নেই। তবু ব্রহ্ম সব কিছুই গ্রহণ করেন, স্থান থেকে স্থানান্তরে যান। দর্শন করেন সব কিছুই। ইন্দ্রিয় নেই প্রত্যক্ষ-ভাবে, তবু ইন্দ্রিয়ের কার্য বর্তমান। এই ব্রহ্মকে তুমি নিরাকার বলে বিচার করো?

সার্বভৌম যেন দুর্বল হতে শুরু করেছেন। গৌরাঙ্গদেরের কথার মধ্যে দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয়, সত্যদ্রষ্টার মতো যেন বলছেন এই তরুণ সন্ন্যাসী। পণ্ডিতের কূটতর্ক—যুক্তির বেড়াজাল—যেন ধীরে ধীরে অসাড় হতে চলেছে। কেমন যেন দুর্বল হতে শুরু করেছেন সার্বভৌম। তিনি যে মায়ার বন্ধনে বদ্ধ, বদ্ধ মানুষ বলেই অবিশ্বাস। সত্যকে অবিশ্বাস, বেদান্তের সূত্রের ব্যাখ্যার মধ্যে কষ্টকল্পিত জটিলতা। ব্রহ্মকে জানতে পারলে—ব্রহ্ম নিরূপম করা যায়। ব্রহ্মকে ইচ্ছা করলেই তো জানা যায় না। অসাধারণ বিদ্যা, জ্ঞানের দ্বারাও নয়। উপনিষদে আছে—আত্মার স্বরূপ বহু অধ্যয়নের দ্বারাও জানা যায় না। জানা যায় না মেধার দ্বারা বা শুধুমাত্র বেদ শ্রবণের দ্বারা। আত্মার স্বরূপ বহু বলশালীর পক্ষেও জানা সম্ভব হয় না। তবে আত্মা কৃপা করে যাকে জানবার সুযোগ দেন, তিনিই তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন।

আত্মার স্বরূপ অর্থ—আত্মার শরীর বলা যায়। তাহলে আত্মা অশরীরী নন। কিন্তু ব্রহ্মের প্রকৃত শরীর নেই, আকার নেই। প্রকৃত ইন্দ্রিয়ও নেই। এই সমস্যার সমাধান অদ্বৈতবাদীদের কাছে সহজ মনে হলেও অত সহজ নয়। এই যে জটিলতা, এই যে সমস্যা—এর ইঙ্গিত রয়েছে বেদ পুরাণ আর উপনিষদে। ব্রহ্মের দেহ, শুদ্ধসত্ত্ব চিন্ময়, অপ্রাকৃত। তাঁর বিভূতিই তাঁর দেহ। ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণানন্দই ঈশ্বরের স্বরূপ। সার্বভৌম তুমি কি বলছো…

ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥ চৈঃ চঃ।

এই ষড়ৈশ্বর্য ঈশ্বরের স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। তাঁকে কি করে নিরাকার বলবো? সচ্চিদানন্দ—ঈশ্বরের সদ্, চিদ্ ও আনন্দ এই তিন অংশ।

ঈশ্বরের সদ্ অংশের যে শক্তি তাঁর নাম সন্ধিনী। এই সন্ধিনী শক্তির বিকাশে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র তাঁর অবস্থিতি। ঈশ্বরের চিদ্ অংশের শক্তির নাম সংবিত। এই শক্তির প্রকাশে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বঅন্তর্যামী। তাই তিনি বিশ্ব-চরাচরের সমস্ত খবর রাখেন। আর আনন্দ অংশের পরিচয় হ্লাদিনী। এই শক্তির বিলাসে ঈশ্বর সর্বচরাচরকে অনুরঞ্জন করে অপার আনন্দের সৃষ্টি করেন। এই আনন্দের হিল্লোলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোড়িত হয়ে থাকে। ঈশ্বরের সদ্ অংশে স্থিত বা অস্তিত্ব, চিদ্ অংশে ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ—সর্বপ্রকাশ, আনন্দাংশে—ঈশ্বর সর্বপ্রিয় হতে প্রিয়তম।

সার্বভৌম নীরব হয়ে গেলেন। গৌরাঙ্গদেব বললেন—সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ। এই ঈশ্বর তিন শক্তিতে বিলাস করেন। এই শক্তিগুলির—চিদ্ শক্তির স্বরূপের নাম অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা স্বরূপের নাম মায়া-শক্তি আর তটস্থা স্বরূপের নাম জীবশক্তি। অন্তরঙ্গার প্রকাশ বৈভবানন্ত—বৈকুণ্ঠাদি ধাম, বহিরঙ্গাই—জগতের কারণ স্বরূপ। তাহার প্রকাশ বৈভবানন্ত—ব্রহ্মাণ্ডগণ। তটস্থা—জীবশক্তির নাম। এই জীবশক্তির আদি নেই অন্ত নেই।

চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাঁহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্যা নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এই স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি॥ চৈঃ চঃ।

ঈশ্বরের এই স্বরূপ ও শক্তি, শক্তির বিলাস সম্পর্কে শাস্ত্রে বিস্তারিত ভাবে লেখা রয়েছে। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে ব্রহ্মকে নিরাকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্মকে বলা হয়েছে নিরাবয়ব। এ বিশ্বাস নিয়ে যাঁরা আছেন, তাঁরা আলাদা। তাঁরা ঈশ্বরের বৈভব বিলাস কোন কিছুই বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মানেন না—ঈশ্বরের বিগ্রহ,

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাঁরা বেদকে অস্বীকার করেন, পুরাণকে অবিশ্বাস করেন। তাঁদেরই বলা হয় নাস্তিক। কি ফল তাঁদের? কি লাভ এই অবিশ্বাসে? যুক্তিতর্কে ঈশ্বর তত্ত্ব অস্বীকার করে আনন্দ কোথায় বলো? কারণ—

জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনলে হয় সর্বনাশ॥ চৈঃ চঃ।

ঈশ্বরের অস্তিত্বই জগতের কারণ স্বরূপ। জগৎ যদি ব্রহ্মর পরিণাম স্বরূপ হয় তবে ঈশ্বরের বিকার আছে মানতেই হবে। এই পরিণামবাদ ব্যাসদেবের সূত্রসম্মত। পরিণামবাদ অনুসারে অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হয়েও অবিকৃত অপরিবর্তিত হয়ে থাকেন। স্বর্ণভার প্রসব করেও মণি যেমন অবিকৃত থাকে, অপরিবর্তিত হয়ে থাকে; জগৎরূপ ঈশ্বরের স্বরূপও থাকেন অপরিবর্তিত। ব্যাসদেবের সূত্রকে ভ্রান্ত প্রমাণ করাবার চেষ্টা করে বিবর্তনবাদ স্থাপন করবার কল্পনা কি মারাত্মক!

পরিণামবাদ ব্যাসের সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বরের তবু অধিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বুলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥ চৈঃ চঃ।

জগৎ মিথ্যা নয়, জীবের দেহে আত্মবুদ্ধিই মিথ্যা। মায়াবাদীরা যা মিথ্যা ভ্রম বলে মনে করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে সেটাই মিথ্যা। দৃষ্টির সামনে যা ভাস্বর, চারদিকে যা দৃশ্যমান তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় কি করে? জগতের অস্তিত্ব আছে, তবে অবিনশ্বর নয়। অস্তিত্বও যদি না থাকে তবে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ই বা কি? জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎ যে ঈশ্বর—এ যেমন সত্য, ঈশ্বরের মহাবাক্য প্রণবও তেমনি সত্য। প্রণব থেকেই সর্ববেদের উৎপত্তি। প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ—মহাওঁঙ্কারধ্বনি। বিশ্বচরাচরে মহাওঁঙ্কারধ্বনি ধ্বনিত। এই ওঁঙ্কারধ্বনি সর্বআশ্রয়ী, সর্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপ। প্রণব মহাবিশ্বকে আবিষ্ট করে থাকে, একে বলা হয় মহাবাক্য। কিন্তু তত্ত্বমসি তো মহাবাক্য

নয়। এই বাক্য প্রাদেশিক। শঙ্করাচার্য বলেছেন—তত্ত্বমসি বা তৎ তমসি…অর্থ তুমিই সেই। হে জীব…তুমিই ব্রহ্ম। অর্থ জীবে ব্রহ্মে অভেদ কল্পনা করা। শঙ্করাচার্যের আরো একটি মন্ত্র—অয়মাত্মা ব্রহ্ম—অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম। আমিই আত্মা …আত্মাই ব্রহ্ম। অর্থাৎ আমিই আত্মা, আমিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মোস্মি…আমিই ব্রহ্ম। এই বাক্যগুলিতেই জীবে ব্রহ্মে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বর জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ করতো অভেদ॥ চৈঃ চঃ।

মায়াধীশ ঈশ্বরের সঙ্গে মায়াবশ জীবের মধ্যে অভেদ অল্পনা কখনোই যথার্থ নয়। শঙ্করাচার্যের বিচার—জীবই ব্রহ্ম। কিন্তু এই বিচারকে যথার্থ না ভেবে যদি বলা যায়—হে জীব…তুমি তো ব্রহ্ম নও, তুমি যে ব্রহ্মের একজন। তুমি ভৃত্য হতে পারো, দাস হতে পারো, বন্ধু হতে পারো। প্রিয়তমও হতে পারো। ব্রহ্ম না হয়েও ব্রহ্মে আছো। এই হল ভক্তিযোগের কথা।

ভক্তিযোগ! প্রেমভক্তির কথা…সার্বভৌম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। নীরব হলেন গৌরাঙ্গদেবের বিচারে আলোচনায়। তাঁর অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে বিরুদ্ধ বিচার, নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার বিপক্ষে কিছুই বলতে পারলেন না পণ্ডিত। এই তরুণ সন্ন্যাসীর বিচার কি অপূর্ব, কি স্বচ্ছ! কোথায়ও জটিলতা নেই। অস্বচ্ছতা, জটিলতা খণ্ডন করে সহজ সরল করবার মধ্যে কোন দম্ভ নেই। পাণ্ডিত্যের অহমিকা নেই। এই বিস্ময়কর প্রতিভা এই তরুণ সন্ন্যাসী কি করে অর্জন করেছেন?

সার্বভৌমকে নীরব দেখে গৌরাঙ্গদেব ভক্তিবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন—সংসারে মায়া মোহে আবদ্ধ জীবের বন্ধন মুক্ত হবে কি করে? জীবের অভিধেয় কি?

অভিধেয় বা জীবের মুখ্য কর্তব্য—সাধন ভজন। এই সাধন ভজনের অন্যতম বিষয় ভগবৎ প্রেম।

ভগবান সম্বন্ধে ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়॥ চৈঃ চঃ।

সম্বন্ধ—ভগবান। কিরূপ ভগবান, যে ভগবানকে জানবার জন্য, পাবার জন্য এত

ব্যাকুলতা, এত আর্তি, সে ভগবান মধুর, মধুর হতেও মধুরতর। ভগবানকে এর চাইতে আর গভীরভাবে ভাবা যায় না, বলাও যায় না। ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতম। এই সম্বন্ধ সেব্য সেবকের, প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের। প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়তমের। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এই সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ এত নিবিড় যে ভক্তের আনন্দে আনন্দিত হন ভগবান। ভক্তের উল্লাসে উল্লসিত হন ভগবান। এই সম্পর্ক কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীজনের।

গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটি গুণ ॥
গোপী দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটি গণ গোপী আস্বাদয় ॥ চৈঃ চঃ।

এই রস আস্বাদনই—ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ। এই রস আস্বাদনে কোন প্রকার মুক্তিই আসে না।

অভিধেয় কি? অভিধেয় অর্থ অভীষ্ঠ। অভীষ্ঠ অর্থাৎ ভগবানকে লাভের জন্য যে উপায় তাই। ভগবানকে কি ভাবে লাভ করা যায়, কি ভাবে জানা যায়! ভগবানকে জানার পন্থা রয়েছে। জানা গেলে হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হয়। সমস্ত সংশয়, সমস্ত পাপ তাপ ক্লেশ সব দূর হয়। জন্ম মৃত্যু একাকার হয়ে যায়। কর্মের ক্ষয় হয়ে সমাপ্তি ঘটে। এই উপায়ই উপাসনা। উপাসনা যোগমার্গে সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। যোগের অধিকারী সবাই হতে পারেন না। চঞ্চল মনকে ধারণ করে বশীভূত করতে যিনি পারেন, তিনিই যোগ সাধনের যোগ্য। যোগে সিদ্ধি লাভের জন্য নানা প্রক্রিয়া, নানা উপকরণ সম্পন্ন করবার পর সিদ্ধি হয়। জ্ঞানের সম্পর্কে বলা যায়। জ্ঞান তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করবার জন্য নিষ্ঠার প্রয়োজন। জ্ঞানও অধিকারভেদের প্রশ্ন তোলে। তাই যোগ সাধন বা জ্ঞান যোগ অভিধেয় হয়েও এই সাধনাকে শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের সাধনা বলা যায় না। শ্রেষ্ঠ অভিধেয় ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের প্রথম কথা —আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়েই ভক্তিযোগ সাধনার শুরু, সমাপ্তি আত্মসমর্পণের মধ্যেই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, যুক্তিতর্কের প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন নেই বিচারবুদ্ধির। শুধু নিষ্কাম ভক্তি। ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়েই ভক্তি সাধনার চরম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

সর্বশেষ—প্রয়োজন। কিসের প্রয়োজন?

সিদ্ধি লাভের জন্য উপাসনা—তাই প্রয়োজন। উপাসনা সম্পর্কে বলা যায়—সংসার-বন্ধন থেকে ত্রিতাপ-জ্বালা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য উপাসনা। বিষয়-বাসনায় আবদ্ধ ইন্দ্রিয়ভোগে লিপ্ত জীব যদি একবার যথার্থ ই উপলব্ধি করে যে সে যথার্থই পাশবদ্ধ জীব, সে এই পাশ থেকে মুক্তি চায়, এই কঠিন গ্রন্থি ছেদ করে মুক্তি চায়, তখন এই প্রবল মুমুক্ষু মন এগিয়ে নিয়ে চলে। এই ইচ্ছাই গাঢ় হয়ে অহর্নিশি স্মরণ-মননের ভেতর দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে উপাসনায়। উপাসনা সে রস-স্বরূপকে পাবার জন্য। রস-স্বরূপকে পাওয়ার অর্থই সেব্যরূপে পাওয়া। এই সেবা-বাসনা থেকেই আনন্দ। আনন্দ থেকেই প্রেম। প্রেমই পরম উপাসনা। প্রয়োজন তাই প্রেমের।

সম্বন্ধ, অভিধেয় আর প্রয়োজন এই তিন বস্তু ছাড়া আর যা যা রয়েছে শঙ্কর-ভাষ্যে তা সবই কাল্পনিক ভাষ্য। তাই ভগবান-সম্বন্ধ, অভিধেয়-ভক্তি, প্রয়োজন-প্রেম এ ছাড়া সবই কল্পনা। বেদ-বেদান্তে এই সব ভাষ্য স্বতঃপ্রমাণিত নয়, কাল্পনিক ভাষ্য। এই ভাষ্যকার স্বয়ং শঙ্করাচার্য, যিনি শিবের অবতার-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন শিবকে—সমস্ত জীব যদি আমাতে আসক্ত হয়ে থাকে, তবে বিষয়বিমুখ হয়ে সব কিছু থেকেই নির্লিপ্ত হবে। প্রজাবৃদ্ধির উপায় কি হবে? তাই তুমি তোমার আগম শাস্ত্রের দ্বারা জীবকে আমা হতে বিমুখ করে আমা থেকে গোপন করে রাখো, যাতে জীব সকল সময় বিষয় ভোগে মত্ত হয়ে প্রজা বৃদ্ধি করবে। এও ঈশ্বরের আদেশ। তাই বলি—

আচার্যের দোষ নাহি ঈশ্বরের আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥ চৈঃ চঃ।

সার্বভৌম নীরবে শুনলেন সমস্ত কথা। কোন প্রতিবাদ তাঁর মুখ দিয়ে বেরুলো না। কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন গৌরাঙ্গদেবের মুখের দিকে তাকাতেই। তাঁর বিচার-বুদ্ধি…চিন্তা-ভাবনা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে জড়বৎ হলেন যেন। অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ সব ভাষ্যই এক এক করে খণ্ডন করেছেন এই তরুণ সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গদেব। সম্বন্ধ-ভগবান, অভিধেয়-ভক্তি, প্রয়োজন-প্রেম-ভক্তিযোগের তত্ত্ব বিচার করেছেন গৌরাঙ্গদেব সুন্দর স্বচ্ছভাবে। সার্বভৌমের সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শিক্ষা, ন্যায়নীতি, তত্ত্বজ্ঞান যেন আচ্ছাদিত হয়েছে অবিদ্যায়।

ভক্তিযোগের প্রবল জলোচ্ছাসে হাবুডুবু খেয়ে ভেসে যেতে চলেছেন সার্বভৌম।

তবু অবিদ্যার শেষ ক্লেশ, অহংবোধের তলানিটুকু নিয়ে অনুভব করলেন…তিনি যেন ভেসে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। বাঁচবার জন্য খড় কুটোর আশ্রয় নিতে চাইছেন। গৌরাঙ্গদেব অনুভব করলেন পণ্ডিতের অসহায় অবস্থা। অহং-বোধের শেষ চিহ্ন মুছে না গেলে ভক্তিযোগের বীজ বপন নিরর্থক। সার্বভৌমের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে গৌরাঙ্গদেব বললেন—তোমার বিস্মিত হবার কারণ নেই পণ্ডিত। ভগবানে ভক্তিই পরুষার্থ লাভ। পরুষার্থ-ধর্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কিন্তু এ সবই ভক্তিযোগের অন্তর্ভুক্ত নয়। সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ পরম পরুষার্থ ভক্তি বা ভগবৎপ্রেম। এই প্রেমই ব্রহ্মানন্দের চাইতেও শ্রেষ্ঠ ধন। এই ধনের নাম প্রেমধন।

প্রভু কহে ভটাচার্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরম পরুষার্থ হয়॥ চৈঃ চঃ।

তুমি কি জানো না পণ্ডিত—

আত্মারাম পর্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগান॥

অর্থাৎ যাঁরা আত্মারাম, আত্মাকে রমণ করেন, যাঁরা মায়া মোহ মুক্ত, অবিদ্যা-শূন্য, সর্বগ্রন্থি হতে মুক্ত, তাঁরা ঈশ্বরের ভজনা করেন। অবিরত ভগবানের গুণগান করেন। ভাগবতে লেখা আছে

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্য হৈতকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরি॥ ভাগবত। ১৭।১০

অর্থাৎ যাঁরা বিধি-নিষেধের অতীত, যাঁদের অহং-গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন হয়েছে, সেই আত্মারাম মুনিগণ ও অতি-পরাক্রম ভগবানে ফলকামনাশূন্য ভক্তির অনুষ্ঠান করে থাকেন। কেন না, শ্রীহরির গুণই এইরূপ।

এই শ্লোকটি শোনবার পর সার্বভৌম গৌরাঙ্গদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন—ভাগবতের এই শ্লোকটির অর্থ তোমার মুখ থেকে শোনবার বাসনা হয়েছে।

গৌরাঙ্গদেব উপলব্ধি করলেন—এখনো সংশয়, এখনো দ্বিধা, এখনো পরীক্ষা।

তাই বিচার করতে চান। জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করতে চান। মৃদু হাসলেন গৌরাঙ্গদেব। তিনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন—তুমি মহাপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ। এই শ্লোকের অর্থ তুমি আমাকে আগে শোনাও। তোমার কাছ থেকে ব্যাখ্যা শোনবার পর আমি যা জানি বলবো।

সার্বভৌম সমস্ত নীতিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র অনুসরণ করে শ্লোকের নানারূপ ব্যাখ্যা করলেন। গৌরাঙ্গদেবকে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

নববিধ অর্থ কৈল শাস্ত্রমত লঞা।
শুনি প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥ চৈঃ চঃ।

সার্বভৌম এই শ্লোকের 'নয়' প্রকারে ব্যাখ্যা করলেন গৌরাঙ্গদেবের সামনে। পণ্ডিত যেন আশ্বস্ত হলেন—এ ছাড়া আর কোনরূপ ব্যাখ্যা হতে পারে না।

গৌরাঙ্গদেব ঈষৎ হেসে বললেন—পণ্ডিত, তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। শাস্ত্র ব্যাখ্যায় তোমার মতো শক্তি কারো নেই। তোমার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রভায় যে অর্থ করলে এ ছাড়াও আরো অর্থ আছে।

সার্বভৌম বিস্মিত হলেন—সে কি! এ ছাড়াও আরো অর্থ হতে পারে?

গৌরাঙ্গদেব বললেন—হ্যাঁ, আরো অনেক অর্থ হতে পারে তোমার ব্যাখ্যাগুলো স্পর্শ না করেই।

সার্বভৌম মুগ্ধ হলেন—বেশ তো, বলো দয়া করে।

ভট্টাচার্যের প্রার্থনায় গৌরাঙ্গদেব ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। আত্মারাম শ্লোকের একাদশ পদের প্রতিটি পৃথক পৃথক অর্থ করে সম্পূর্ণ নতুন রূপ আঠারো প্রকারের ব্যাখ্যা করলেন। ভগবান ও তাঁর শক্তির গুণগান করলেন। ভগবানের অচিন্ত্য প্রভাব সম্পর্কে বললেন। উদাহরণ স্বরূপ সনক, শুকদেবের কথা উল্লেখ করলেন। এ সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা…প্রতিটির সঙ্গে প্রতিটির কোন সূত্র নেই। এ অসাধারণ পাণ্ডিত্য তো সাধারণ তরুণ সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব নয়! শ্রদ্ধা আসতে শুরু করলো ও সেই সঙ্গে বিশ্বাস, শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস। এই তরুণ সন্ন্যাসীকে তিনি বেদান্ত শ্রবণ করিয়েছেন, এই তরুণ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করার অধিকার জানতে চেয়েছিলেন। কে এ সন্ন্যাসী! এই সন্ন্যাসীর দেহে প্রেমের বিকার-চিহ্ন লক্ষ্য করেছিলেন। ঈশ্বরের নাম করতে করতে অষ্ট সাত্ত্বিক চিহ্নের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সন্ন্যাসীর দেহে প্রেমের যে বিকার তিনি লক্ষ্য করেছিলেন

সেই লক্ষণ শাস্ত্রে বর্ণিত রাধারাণীর মধ্যেই ছিল। এই অসাধারণ প্রেমভক্তির মূর্ত প্রতীক তরুণ সন্ন্যাসী কি যথার্থই অবতার পুরুষ!

প্রভুকে কৃষ্ণ জানি কহি আপনাধিকার॥
ইহোঁতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞি না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্বিত হইয়া॥ চৈঃ চঃ।

সমস্ত অহংকার, গর্ব, আত্মাভিমান, পাণ্ডিত্যের দম্ভ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কি আছে তাঁর…যা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন? তাই

আত্মনিন্দা করি কৈল প্রভুর শরণ॥

কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি পেলেন সার্বভৌম। প্রেমভক্তির সঞ্চার হল তাঁর দেহে। চোখের সামনে দেখতে পেলেন প্রেমভক্তির মূর্ত প্রতীক। গৌরাঙ্গদেব যেন কৃপা করলেন পণ্ডিতকে।

নিজরূপে প্রভু তারে করাইলা দর্শন।
চতুর্ভুজ রূপ প্রভু হইলা তখন॥
দেখাইলা তাঁরে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥ চৈঃ চঃ।

দণ্ডবত হয়ে সার্বভৌম পুনঃ পুনঃ স্তুতি করতে শুরু করলেন। গৌরাঙ্গদেব তাঁকে আলিঙ্গন করতেই প্রেমাবেশে সার্বভৌম অচেতন হয়ে গেলেন। সর্বাঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক চিহ্ন প্রকাশ পেল।

অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক স্বেদ কম্প থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ি প্রভু পদ ধরি॥

গৌরাঙ্গদেব আনন্দিত হলেন—পণ্ডিত, তুমি যথার্থই পরম ভক্ত। জগন্নাথ তোমায় কৃপা করেছেন, তাই তুমি ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করেছো। সার্বভৌম করজোড়ে স্তুতি করলেন গৌরাঙ্গদেবকে।

জগৎ নিস্তারিলে তুমি সে অল্পকার্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য ॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহ পণ্ডিত।
আমারে দ্রবাইলা তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ চৈঃ চঃ।

একদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির দর্শনান্তে গৌরাঙ্গদেব গেলেন সার্বভৌমের গৃহে। সার্বভৌম সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করেছেন। বাইরে এসেই গৌরাঙ্গ দর্শন হতেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে উঠলেন। গৌরাঙ্গদেবের চরণ বন্দনা করে আসনে বসাতেই, গৌরাঙ্গদেব মহাপ্রসাদ তুলে দিলেন সার্বভৌমের হাতে। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন হয়নি সার্বভৌমের। স্নান, দন্তধাবন কিছুই হয়নি তখনো। তবু বিনা দ্বিধায় মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করলেন পণ্ডিত। মহানন্দে বিহ্বল হলেন গৌরাঙ্গদেব। এই তো তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। নীলাচলের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত—মায়াবাদী, ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত সার্বভৌম ভক্তিবাদে বিশ্বাসী হয়েছেন। প্রেমাবিষ্ট হয়ে গৌরাঙ্গদেব আলিঙ্গন করলেন সার্বভৌমকে। দুজন নৃত্য করলেন, কীর্তন করলেন। দুজন দুজনকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। প্রেমাবিষ্ট হয়ে গৌরাঙ্গদেব বললেন—আজ আমি ত্রিভুবন জয় করেছি। আজ আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেছি। আজ আমার অভিলাষ পূর্ণ হল। সুদূর নবদ্বীপ থেকে এসেছি নীলাচলে…জগন্নাথ দর্শন করতে… আর তোমার জন্য। আজ তুমি কৃষ্ণাশ্রয় পেয়েছো…। মায়াবাদী…অদ্বৈতবাদী… অবিদ্যা…দূর হয়ে গেছে দেহ মন থেকে।

ব্যাকুল হয়ে বললেন গৌরাঙ্গদেব—

আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সব অভিলাষ।
সার্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈল সদয় ॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥

১। আটিসারা / আঠিসারা।

বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলায় আদি গঙ্গার তীরে অবস্থিত গ্রাম আটিসারা। শান্তিপুর থেকে গৌরাঙ্গদেব পদযাত্রা শুরু করেছিলেন নীলাচলের দিকে। এই পথেই পড়েছিল ফুলিয়াগ্রাম, কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়া, সাইবন, তারপর পানিহাটি। সমস্ত পথই ভাগীরথীর পূর্বপাড় দিয়ে। তারপর ভাগীরথীর মূল জলধারার অধিকাংশই প্রবাহিত হয়েছিল বর্তমান খিদিরপুরের পাশ দিয়ে। পরে ভাগীরথীর মূলধারা শুকিয়ে যেতে শুরু করে। পরে এই ধারা সংস্কার করেছিলেন টালি সাহেব। তাঁর নামে আদি গঙ্গাকে টালি নালা বলা হয়। গৌরাঙ্গদেবের সময় আদি গঙ্গাই টালি নালা। এই আদি গঙ্গার তীরে তীরে ছিল গভীর বন। আর বনের মাঝে মাঝেই ছিল গ্রাম। আটিসারা এমনি একটি গ্রাম। গৌরাঙ্গদেব পানিহাটির পর থেকেই গঙ্গার মূলধারা অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন সাগরের দিকে। এই পথেই গঙ্গার তীরে গভীর বনের মধ্যে কালীঘাট, তারপর বর্ধিষ্ণু গ্রাম বোড়াল, বারুইপুর, বহড়ু। বর্তমান বারুইপুর গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বর্ধিষ্ণু গ্রাম হলেও বারুইপুর ছিল আয়তনে ছোট, তৎসংলগ্ন গ্রামগুলির নাম—মাদারাট, কীর্তনখোলা ও আটিসারা। পরবর্তীকালে সব গ্রামগুলো বারুইপুর নামে পরিচিত হয়েছিল। আটিসারায় গৌরাঙ্গদেবের রাত্রিবাসের স্থানটি আজও চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

২। ছত্রভোগ।

আটিসারা গ্রামের পরেই গঙ্গার প্রশস্ত ধারার তীরে সে যুগের বিখ্যাত বন্দর-নগর ছত্রভোগ। বর্তমান জয়নগর, মজিলপুর গ্রামের কাছেই ছত্রভোগ। এই স্থানটি সেকালের বিখ্যাত তীর্থস্থান বলে পরিগণিত হত। সাগরতীর্থযাত্রী দল বেঁধে আসতেন কালীঘাট দর্শন করে আটিসারা, সেখান থেকে পৌছতেন ছত্রভোগ। ছত্রভোগের অনতিদূরে গঙ্গা শতমুখী হয়ে সাগরে প্রবেশ করেছিল। সেই স্থানে গঙ্গা প্রশস্তা। গৌরাঙ্গদেবের সময় ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথী তখন প্রবল নদী। নদীর দু পাড়ে গভীর বনভূমি। শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি।

৩। অম্বুলিঙ্গ ঘাট।

ছত্রভোগের পরই অনতিদূরে শতমুখী গঙ্গার তীরেই সেকালের বিখ্যাত শিবমন্দির অম্বুলিঙ্গ। সারদাচরণ মিত্রের লেখা 'উৎকলে শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থে দেখা যায়—

জেলা ২৪ পরগণা অন্তর্গত বর্তমান থানা মথুরাপুরের এলাকাধীন ও মথুরাপুর গ্রামের নিকটস্থ ছত্রভোগ গণ্ডগ্রাম ছিল। তথায় অদ্যাপি ত্রিপুরা সুন্দরী ঠাকরুণের মঠ অবস্থিত। জয়নগর মজিলপুর গ্রাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে খাড়ী—জমিদারের

বাড়ির অন্তর্গত। ছত্রভোগ হইতে মাত্র পোয়া মাইল দূরে বদরিকানাথের প্রসিদ্ধ মন্দির—মহাদেবের অনাদিলিঙ্গ। এখানে এক্ষণে নিম্নভূমি মাত্র। ভাগীরথীর অস্তিত্ব-চিহ্ন মাত্র বর্তমান। কিন্তু ভাগীরথী গর্ভ এখনো চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। ভাগীরথী এখন মজে গিয়েছে। ১৫১০ খৃষ্টাব্দেও এ নদী ছিল প্রবল।

"উৎকলে শ্রীচৈতন্য" গ্রন্থে লেখা আছে—ছত্রভোগের নিকটে নদীগর্ভে জল নাই। নিম্নভূমিতে ধান্য, ধান্যক্ষেত্র এবং নিকটেই কুলপী যাইবার রাজপথ। কুলপী ডায়মণ্ড-হারবারের প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। কুলপীর অনতিদূরেই দক্ষিণ দিকে সাগর-সঙ্গম। এই সাগর-সঙ্গমের নিকটেই বর্তমান সাগর দ্বীপ।

৪। প্রয়াগঘাট।

জলপথে গৌড় দেশ সীমান্ত পেরিয়ে উৎকল সীমানায় অবস্থিত ঘাটের নাম প্রয়াগঘাট।

৫। গঙ্গাঘাট।

প্রয়াগঘাটের সন্নিকটেই অবস্থিত গঙ্গাঘাট। সম্ভবতঃ গৌরাঙ্গদেব সাগর-সঙ্গমে গঙ্গার বিশাল জলধারা অতিক্রম করে উৎকল সীমান্তের ঘাটে অবতরণ করেছিলেন। সেই ঘাটের নাম গঙ্গাঘাট। গৌরাঙ্গদেবের সময়ে সম্ভবতঃ বর্তমান মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ উৎকল বা ওড্র দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গঙ্গাঘাটটি যে কোথায় এ তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বৎসর পূর্বে আদি গঙ্গার বিপুল জলরাশি সমুদ্রে এসে মিশে-ছিল। সেই সঙ্গম-স্থানটি ছত্রভোগের সন্নিকটেই ছিল। রেনেলের মানচিত্রে এই অঞ্চল সম্পর্কে দেখা যায়—সে যুগে ছত্রভোগে গঙ্গার জলপ্রবাহ যেমন বিশাল ছিল, তেমনি নাব্য ছিল। ছত্রভোগের পর গঙ্গা শতমুখী হয়ে খাড়ীতে প্রবেশ করেছিল। এইরূপ একটি খাড়ী—বর্তমান কাকদ্বীপের পাশ দিয়ে গিয়েছিল সমুদ্রে। কাকদ্বীপের নামকরণের সম্পর্কে শোনা যায় যে—মহারাজা ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করে সাগরের সন্নিকটে এসেছিলেন। ভোরে যে স্থানে প্রথম কাক ডেকেছিল সেই দ্বীপের নাম হয়েছিল কাকদ্বীপ। গৌরাঙ্গদেব হয়তো বর্তমান কন্টাই মহকুমার রসুলপুর নদীতে প্রবেশ করেছিলেন নৌকা যোগে। এই রসুলপুর নদীর তীরে পুরানো ঘাট ছিল। সেই ঘাট থেকে যাত্রীরা গঙ্গাসাগরে যাত্রা করতেন। এই স্থানটিকেই হয়তো প্রয়াগ-ঘাট বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। ডঃ দীনেশ সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে লেখা আছে—মেদিনীপুর একসময় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫১০ সনে) চৈতন্য-দেব পদব্রজে দশ ক্রোশব্যাপী এক বৃহৎ জঙ্গল অতিক্রম করিয়াছিলেন।

গঙ্গাঘাটকে অনেকে মনে করেন হিজলী বন্দর। পর্তুগীজ বণিক প্রথম জাহাজ ভিড়িয়েছিল হিজলীতে। তার পরই হিজলী বিদেশী বণিকদের প্রধান বন্দর নামে পরিচিত হয়েছিল। পরে কলিকাতা প্রতিষ্ঠিত হবার পর হিজলীর গৌরব ম্লান হয়ে যায়।

৬। সুবর্ণরেখা।

উৎকল রাজ্যের বিখ্যাত নদী সুবর্ণরেখা।

৭। জলেশ্বর।

সুবর্ণরেখার তীরদেশে অবস্থিত বালেশ্বর জেলায় অবস্থিত তীর্থস্থান জলেশ্বর। প্রাচীনকালে জলেশ্বর ছিল নারায়ণপুর খণ্ডরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। গৌরাঙ্গদেবের সময় সমস্ত উৎকল রাজ্য ছোট ছোট খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল।

৮. রেমুনা।

বালেশ্বর থেকে পাঁচ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান রেমুনা। রেমুনায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দির রয়েছে।

৯. যাজপুর।

যাজপুর একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। এই স্থানকে বিরজাক্ষেত্র বলা হয়। বিরজায় সতীর নাভিস্থান পড়েছিল। বৈতরণী নদীর সন্নিকটে এই যাজপুর অবস্থিত। ব্রহ্মা এই স্থানে যজ্ঞ করেছিলেন বলে স্থানের নাম হয়েছিল যাজপুর বা যজ্ঞপুর। গয়াসুরের মস্তক গয়াতে পড়েছিল। যাজপুরে পড়েছিল অবশিষ্ট অংশ। যাজপুরে গয়াসুরের নাভি পড়েছিল বলে এজন্য একে নাভিগয়াও বলা হয়। এখানে অনেক-গুলি দেবদেবীর মন্দির রয়েছে। দশম শতাব্দী পর্যন্ত যাজপুর উৎকলদেশের রাজধানী ছিল। বৈতরণী নদীর একটি দ্বীপে বরাহনাথ বা বিষ্ণুর বরাহ অবতার মূর্তি রয়েছে। এই মন্দির সংস্কার করেছিলেন প্রতাপরুদ্রদেব। বালেশ্বর থেকে যাজপুরের দূরত্ব চল্লিশ মাইল।

১০. কটকনগর।

বৈতরণী নদীর তিরিশ মাইল দূরে কটক অবস্থিত। পূর্বযুগে নাম ছিল কটকপুর। উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রদেব কটকে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। সম্ভবতঃ তার পূর্বে যাজপুর উৎকলের রাজধানী ছিল। কটকপুর গড়ে উঠেছিল কাটাজুড়ি ও মহানদীর সঙ্গম-স্থলে।

১১. বিদ্যানগর/সাক্ষীগোপাল।

কটক রেল স্টেশন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। গৌরাঙ্গদেব কটক থেকে

এগিয়ে গিয়ে বিদ্যানগর অতিক্রম করে সাক্ষীগোপাল দর্শন করেছিলেন। তারপর গিয়েছিলেন ভুবনেশ্বর। গৌরাঙ্গদেবের সময় সাক্ষীগোপাল যে স্থানে অবস্থিত ছিল, সে স্থান কটক ও ভুবনেশ্বরের মাঝামাঝি স্থানে—বিদ্যানগর পেরিয়ে। গৌরাঙ্গদেবের পরবর্তীকালে সাক্ষীগোপালের মূর্তি সরিয়ে নিয়ে বর্তমান স্থান সত্যবাদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পুরী গেজেটিয়ারে দেখা যায়—সাক্ষীগোপালের মূর্তি স্থানান্তরের কথা।

The image was at first at Vidyanagar (Vijaynagar). Then it was removed to and installed at Cuttack by Purushottama Deva (1471-97 Ad.)

সাক্ষী গোপাল মূলতঃ ছিল বৃন্দাবনে। তারপর সাক্ষ্য দেবার জন্য গোপাল এসেছিলেন বিদ্যানগরের সন্নিকটে। বিদ্যানগরের রাজা সুন্দর উদ্যানের মধ্যে এই মূর্তি স্থাপিত করে মন্দির নির্মাণ করান। পরে রাজা পুরুষোত্তমদেব যুদ্ধ করে বিদ্যানগর জয় করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজা সাক্ষীগোপালকে নিয়ে আসেন কটকে। মূর্তি স্থাপিত করে মন্দির নির্মাণ করান। সেই সময়কার মন্দির দর্শন করেছিলেন গৌরাঙ্গদেব। পরে আবার এই মূর্তি সরিয়ে নিয়ে স্থাপন করা হয়েছিল পুরীর বারো মাইল উত্তরে। সেখানেই মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। সাক্ষীগোপালের নামে রেল স্টেশনও হয়েছিল। আমরা বর্তমান সাক্ষীগোপালের মন্দির দর্শন করি সাক্ষীগোপাল রেল স্টেশন থেকে অবতরণ করে।

১২. ভুবনেশ্বর

বর্তমান উড়িষ্যার রাজধানী। প্রাচীন যুগের ভুবনেশ্বর—রাজধানী ভুবনেশ্বর থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। ভুবনেশ্বরের আর এক নাম ছিল গুপ্তকাশী। গৌরাঙ্গদেব ভুবনেশ্বরে একাম্রকাননে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করে লিঙ্গরাজের মন্দিরে শিবের আরাধনা করেছিলেন। ভুবনেশ্বরের কাছেই বিন্দু সরোবর। একটি প্রস্রবণও রয়েছে।

১৩. কমলপুর

ভুবনেশ্বর পেরুবার পর কমলপুর। এই স্থান থেকেই পুরীর মন্দিরের ধ্বজা দেখতে পাওয়া যায়।

১৪, আঠারো নালা

পুরীর সন্নিকটে একটি সাঁকোর নাম আঠারো নালা। সাঁকোর আঠারোটি খিলেন রয়েছে। খিলেনের পাথর রক্ত বর্ণের। পুরী গমনাগমনের জন্য সম্ভবত ১০৪০ সনে রাজা মৎস্যকেশরী এই সাঁকো নির্মাণ করিয়েছিলেন।

দক্ষিণ দেশে

এই মতে সার্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥ চৈঃ চঃ।

অদ্বৈত দর্শনে সুপণ্ডিত মায়াবাদী সার্বভৌম আত্মসমর্পণ করলেন ভক্তিবাদের কাছে। শরণাগত হলেন তিনি। সার্বভৌম ভক্তিবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় সমস্ত উৎকল রাজ্যে প্রেমের বান ডাকলো। গৌরাঙ্গদেব আর সাধারণ মানুষ নন, অসাধারণ সন্ন্যাসী। সার্বভৌম বিশ্বাস করেন, প্রচারও করেছেন—এই তরুণ সন্ন্যাসী অবতার পুরুষ।

গৌরাঙ্গদেবও আনন্দে আত্মহারা। তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। ভক্তিবাদ বয়ে নিয়ে এসেছিলেন নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে। কৃষ্ণ প্রেমে ভেসে গেছে নীলাচল। এবার পরবর্তী কার্য, দক্ষিণ দেশে যাত্রা। সেখানে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই স্বপ্ন সার্থক হবে। তাই সবাইকে বললেন—

তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধু কৃত্য কৈলে।
ইহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে॥
এবে সবা স্থানে মুঞি মাগো একদানে।
সবে মিনি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে॥ চৈঃ চঃ।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—এবার তোমরা আজ্ঞা দাও, আমি দক্ষিণ দেশে যাবো।

ভক্তবৃন্দ দুঃখে বেদনায় হতবাক। আবার গৌরাঙ্গদেবের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত। বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না সবাই। এই নীলাচলেই তো জগন্নাথ রয়েছেন। অহর্নিশি তাঁর দর্শন হবে। এই জগন্নাথ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি সুদূর নবদ্বীপ তথা শান্তিপুর থেকে চলে এসেছেন নীলাচলে। আবার নীলাচল ত্যাগ করে দক্ষিণ দেশে যাবার ইচ্ছে কেন? সে পথ তো আরো দীর্ঘ, আরো দুর্গম। সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ অপরিচিত মানুষ। কেন এই ইচ্ছা? অপরিচিত বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ পথে যাবার বাসনা গৌরাঙ্গদেবের। একবার তাঁর মুখ থেকে যে কথা বার হয়েছে তার যে অন্যথা হবে না। ভয় পেয়ে গেলেন সবাই। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ…সবাই ব্যাকুল

হয়ে উঠলেন, ব্যথিত হলেন। গৌরাঙ্গদেব হয়তো অনুভব করতে পারলেন। তিনি সবার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন—তোমাদের সবাইকে আমি প্রাণাধিক মনে করি। তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারি না। তবু আমাকে যেতেই হবে···তোমাদের ছেড়ে।

বিশ্বরূপ উদ্দেশ্যে অবশ্য আমি যাব।
একাকী যাইবো কাহো সঙ্গে না লইব ॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ ॥ চৈঃ চঃ।

সবার মুখ শুকিয়ে গেল। এই দীর্ঘ পথ—নীলাচল থেকে সেতুবন্ধ। একাকী যেতে চান গৌরাঙ্গদেব। এ কি অসম্ভব পরিকল্পনা। বাধা দিলেন নিত্যানন্দ—এসব কি বলছো তুমি? এ সম্ভব নয়। এই দীর্ঘপথ তুমি একাকী যেতে পারবে না। নিতান্ত যাবেই যখন, দু এক জনকে সঙ্গে নিয়ে চলো। আমি দক্ষিণ দেশের সমস্ত তীর্থপথ জানি। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

গৌরাঙ্গদেব হেসে বললেন—তুমিই তো আমার সব। তোমার জন্যই আমার এই সব হয়েছে। আমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে বৃন্দাবনে যাবার মনস্থ করেছিলাম। তুমিই আমাকে পথ ভুলিয়ে অন্য পথে নিয়ে এসেছিলে। তারপর গঙ্গাকে যমুনা বলে নিয়ে এসেছিলে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে। নীলাচলে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে সন্ন্যাসীর অবলম্বন দণ্ড তুমি আমার হাত থেকে নিয়ে ভেঙে ফেলে দিয়েছিলে। আমি তোমাকে ভালভাবে চিনেছি। তোমার গাঢ় ভালবাসা, স্নেহ আমার সব কাজ পণ্ড করবে। তোমার জন্য আমি ইচ্ছামত কিছুই করতে পারি না।

নিত্যানন্দ নীরব হয়ে গেলেন গৌরাঙ্গদেবের কথা শুনে।

জগদানন্দের দিকে তাকিয়ে গৌরাঙ্গদেব বললেন হেসে—জগদানন্দ আমাকে বিষয়ী করে তুলতে চায়। আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস জীবনযাপন করবার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়। জগদানন্দ তা মানতে চায় না। আমার জন্য ভালো খাবার, ভালো বিছানার ব্যবস্থা করতে চায়। আমাকে সর্বক্ষণ সুখে ভোগে রাখতে চায়। আপত্তি করলে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনদিন অনশন করে। তারপর আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে।

কোন উত্তর দিলেন না জগদানন্দ গৌরাঙ্গদেবের কথায়।

গৌরাঙ্গদেব মুকুন্দের দিকে তাকাতেই বললেন—মুকুন্দ আমার সমস্ত কার্য লক্ষ্য করে, কিছুই বলে না। আমি শীতকালেও তিনবার স্নান করি। কঠিন ভূমিশয্যায় শয়ন করি। আমার কৃচ্ছ্রসাধন পর্যবেক্ষণ করে মুকুন্দ সবই। আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লক্ষ্য করে, আর অন্তরে সে কাঁদে। আমি জানি একথা। সর্বক্ষণ বিষাদ-গ্রস্ত হয়ে থাকে মুকুন্দ। সন্ন্যাসীর নিয়ম পালন করি মাত্র, তাতে আমার কোন কষ্ট নেই, দুঃখ নেই। কিন্তু মুকুন্দ আমার নিয়ম পালনের কঠোরতা দেখে দুঃখ পায়, বেদনা পায়। এমন কোমল হৃদয় তার। তার দুঃখ বেদনা আমার হৃদয়ে দ্বিগুণ হয়ে বেঁধে।

মুকুন্দ কোন কথা বলতে পারেন না। তাঁর চোখ দুটো ছলছল করে।

গৌরাঙ্গদেব দামোদরের দিকে তাকান—দামোদর ব্রহ্মচারী। গৌরাঙ্গদেব বললেন—কঠোর নিয়মনিষ্ঠা আর বিধিনিষেধের মধ্যে জীবনযাপন করেন। তাঁর সমস্ত বিধিনিষেধ আমার ওপরেও আরোপ করে। দামোদর যেন শিক্ষাদণ্ড নিয়ে বসে থাকে আমার সামনে। আমি তাই বিধিনিষেধের গণ্ডী পেরিয়ে যেতে পারি না, স্বাধীনভাবে কৃষ্ণকথা বলতে পারি না, কৃষ্ণ গান গাইতে পারি না। কৃষ্ণবিরহে কাঁদতেও পারি না প্রাণভরে।

সবাই নীরব হয়ে তাকিয়ে দেখে গৌরাঙ্গদেবকে। গৌরাঙ্গদেব হেসে বলেন—আমি বুঝি, এসব তোমাদেরই স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন। এই বন্ধন থেকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য মুক্তি চাই। এই মুক্তির আনন্দ নিয়ে একাকী দাক্ষিণাত্যে যেতে চাই। তোমরা আমায় বাধা দিয়ো না। আমাকে যেতে দাও।

> অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে।
> দিনকত তীর্থ আমি ভ্রমিব একলে। চৈঃ চঃ।

গৌরাঙ্গদেব ভক্তগণের স্নেহ-ভালবাসার গাঢ়ত্বকে দোষরূপে ছল করে গুণের আস্বাদন করলেন। সবার অনুরোধ—অবশেষে কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নেবার অনুমতি দিলেন। তারপর সার্বভৌমের কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন।

সার্বভৌমের গৃহে প্রবেশ করতেই গৌরাঙ্গদেবকে প্রণাম করে সযত্নে আসনে বসালেন।

নানা কৃষ্ণবার্তা প্রভু কহিল তাহারে।
তোমার ঠাঞি যাইলাম আজ্ঞা মাগিবারে ॥

সার্বভৌম চমকে উঠলেন কিসের আজ্ঞা? গৌরাঙ্গদেবের মুখের দিকে তাকালেন অবাক হয়ে। গৌরাঙ্গদেব তাঁর অভিপ্রায় জানালেন। কাতর হলেন সার্বভৌম এ কথা শুনেই। গৌরাঙ্গদেবের চরণযুগল ধরে অনুনয় করলেন—বহু জন্মের পুণ্যফলে তোমার সঙ্গ পেয়েছি। তোমার বিচ্ছেদ আমি সহ্য করতে পারবো না। তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবো না।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—তোমার কষ্ট, দুঃখ আমি অনুভব করতে পেরেছি। তবু উপায় নেই, আমাকে যে যেতেই হবে।

সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তার অন্বেষণে ॥
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে শুভ লেউটি থামিব ॥ চৈঃ চঃ।

সার্বভৌমের সঙ্গে সঙ্গে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বিশ্বরূপের অন্বেষণে যাবেন দক্ষিণে! এ কি অদ্ভুত কথা...

বিশ্বরূপ গৌরাঙ্গদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। নিত্যানন্দের দেহের সঙ্গে বেশ মিল ছিল—বিশ্বরূপের। শচীদেবীর কখনো কখনো ভ্রম হত, নিত্যানন্দ তাঁরই সেই হারানো পুত্র বিশ্বরূপ। সম্ভবত মায়ের কথা ভেবেই গৌরাঙ্গদেব নিত্যানন্দকে বলেছিলেন যে তিনি অনুমতি পেলে দাদা বিশ্বরূপের সন্ধানে যাবেন।

কিন্তু বিশ্বরূপ ইহজগতে নেই, এ খবর গৌরাঙ্গদেব নিশ্চয়ই জানতেন। সংসার ধর্ম ত্যাগ করে বিশ্বরূপ মাত্র অষ্টাদশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করে গিয়েছিলেন দক্ষিণ দেশে। সেখানে পাণ্ডুপুরে দেহত্যাগ করেছিলেন। এ খবর সবারই জানা। তবে শচীদেবীর কাছে এ সংবাদ জানানো হয়নি। তবু গৌরাঙ্গদেব বিশ্বরূপের সন্ধানে দক্ষিণ দেশে যাবেন—এ কথা কেমন করে বলেন?

বিশ্বরূপের সিদ্ধি প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে করে এই ছল॥ চৈঃ চঃ।

প্রেমধর্ম প্রচার, কৃষ্ণনাম প্রচারের জন্য গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপ তথা শান্তিপুর হতে এসেছিলেন নীলাচলে। নীলাচলে তাঁর সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। এবার দাক্ষিণাত্যে প্রেম ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মপ্রচার এই উদ্দেশ্যের কথা তিনি তো সহজ অবস্থায় মুখে আনতে পারেন না, বলতে কুণ্ঠাবোধ করবেন। কারণ, তিনি যে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। বৈষ্ণবের প্রধান পরিচয় তিনি তাঁরই রচিত শ্লোকে বলেছিলেন ভক্ত রঘুনাথ দাসকে

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরিঃ॥

যিনি তৃণের চাইতেই সুনীচ, তরু অপেক্ষাও যিনি সহিষ্ণু, স্বয়ং অমানী হয়েও অপরকে মান দান করেন, হরিনাম সঙ্কীর্তন যাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব।

গৌরাঙ্গদেব দীন হতেও দীন হয়েছেন। দাক্ষিণাত্যে হরিনাম প্রচারিত হয়নি। তাই সেই দেশেই নাম প্রচার করবার জন্যই তিনি দক্ষিণ দেশে গমন করবার স্থির সঙ্কল্প করেছেন। ভক্তগণের কাছে তাই অনুমতি চেয়েছেন। এ কথা তিনি ভক্তদের বলতে পারতেন—তোমরা আমাকে অনুমতি দাও, আমি দাক্ষিণাত্যে ধর্মপ্রচার করতে যাবো।

পরমবৈষ্ণব গৌরাঙ্গদেব। দৈন্যের অবতার তিনি। সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় তিনিও ভক্তবৃন্দের প্রত্যেকের কাছে অনুনয় বিনয় করে বলতেন—তোমরা আমার ভক্ত। তোমরা আমাকে কৃপা করো, যাতে আমার কৃষ্ণে মতি হয়। তিনি মুখে কি করে বলবেন দম্ভ প্রকাশ করে—দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করবার জন্যই আমাকে যেতে হবে। এই স্পষ্ট কথায় যে দম্ভ প্রকাশ পায়। তাই বিশ্বরূপ দর্শন করবার কথা কি যথার্থ ই ছলনা? ভক্তদের মতে গৌরাঙ্গদেব ঈশ্বর। সেইজন্য তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি বিশ্বরূপের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে যাবেন কেন! কারণ, তিনি জানতেন, বিশ্বরূপ বহু পূর্বেই দেহরক্ষা করেছেন। তাই এ তাঁর যথার্থ ছলনা নয়। বিশ্বরূপের সন্ধানের ছলনায় তিনি কৃষ্ণনামের মহিমা প্রচার করবার জন্য দাক্ষিণাত্যে যাবার মনস্থ

করেছেন। গৌরাঙ্গদেব নিজের ওপরে কখনো ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন নি। তিনি তাঁর কথায় ভাবে, নিজেকে সর্বজ্ঞ বলেও মনে করতেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহত্যাগ ও রহস্যপূর্ণভাবে দেহত্যাগের সংবাদ তাঁকে দাক্ষিণাত্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল নিশ্চয়ই। তাই দক্ষিণদেশে কৃষ্ণমহিমা প্রচারের জন্য মনস্থ করার মধ্যে মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নেননি। এ ছলনা শুধু কৃষ্ণনামমহিমা প্রচারের জন্য।

বিশ্বরূপ উদ্দেশ্যে আমি অবশ্য যাইব।
... ...
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণ॥

গৌরঙ্গাদেবের এই আন্তরিকতাপূর্ণ বাক্যের মধ্যে ছলনা প্রচ্ছন্ন মাত্র। তাঁর বিশ্বরূপ সন্ধানকে—কর্তব্যের কথা—ভক্তদের সামনে প্রকাশ করে দাক্ষিণাত্যে ভক্তি যোগ প্রচারকার্য সম্পন্নকে প্রচ্ছন্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন। ছলনা এইখানেই।

সার্বভৌম পণ্ডিতের কাছে গৌরাঙ্গদেবের দাক্ষিণাত্য যাত্রার তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন ছিল না হয়তো। তাই তাঁর বিচ্ছেদ যত কষ্টকরই হোক, দাক্ষিণাত্যে যাত্রাকে বাধা দিতে চাননি তিনি।

তাই তিনি বলেছিলেন

শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরে যায়।
তাহা সহি তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিলে গমন।
দিন কত রহো দেখি তোমার চরণ॥ চৈঃ চঃ।

সার্বভৌমের সনির্বন্ধ অনুরোধে অনুনয়ে বিনয়ে পাঁচ দিন রইলেন নীলাচলে। জগন্নাথ মন্দিরে গৌরাঙ্গদেবকে নিয়ে সার্বভৌম জগন্নাথের কাছ থেকে আজ্ঞা চেয়ে নিলেন দাক্ষিণাত্যে যাবার জন্য। জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করে গৌরাঙ্গদেব মহানন্দে নৃত্য করতে করতে দক্ষিণদেশে যাত্রা করলেন। যাত্রাকালে সার্বভৌম অনুরোধ করলেন— তুমি দাক্ষিণাত্যে যাবার পথে গোদাবরী তীর্থে যাবে। সেখানে বিদ্যানগরের রায় রামানন্দ রয়েছেন। তিনি শূদ্র, বিষয়ী মনে করে উপেক্ষা কোরো না। তিনি রসজ্ঞ, তোমার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হবে। তাঁর পাণ্ডিত্য আর ভক্তি দুইয়েরই সীমা

নেই। পূর্বে তাঁকে বৈষ্ণব বলে উপহাস করতাম। আজ তোমার কৃপায় আমি তাঁকে যথার্থই চিনতে পেরেছি। তুমি অবশ্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে অপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সাদর যোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্যে আর ভক্তিরস দুঁহের তিঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তার না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তারে বৈষ্ণব জানিয়া॥
তোমার প্রসাদে ইবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ত্ব॥ চৈঃ চঃ।

গৌরাঙ্গদেব তাই চেয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যের তীর্থপথে রসজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞের সাক্ষাৎ তাঁর প্রয়োজন। ভক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গে রস আলাপন দীর্ঘ পদযাত্রার পাথেয় হয়ে থাকবে। তেমনি বিরুদ্ধবাদী তত্ত্বজ্ঞের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা প্রচার হবে। এমনি করেই ভক্তিযোগের প্রচার হবে ঘরে ঘরে। গ্রামে গ্রামে।

সার্বভৌমের অনুরোধে সম্মতি জানালেন গৌরাঙ্গদেব।

অঙ্গীকার করি প্রভু তাহার বচন।
তারে বিদায় দিতে তারে কৈল আলিঙ্গন॥ চৈঃ চঃ।

শোকে দুঃখে মুহ্যমান সার্বভৌম—কোন কথাই আর বলতে পারছিলেন না।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—তুমি ঘরে বসে কৃষ্ণ ভজনা কর। আমাকে আশীর্বাদ করো, যাতে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর যেন নীলাচলে এসে তোমার প্রসাদ লাভ করি।

সার্বভৌম শোকে দুঃখে মূর্ছিত হলেন।

বিদায় নিলেন গৌরাঙ্গদেব নীলাচল থেকে। চললেন আলালনাথের দিকে।

পূর্বেই নিত্যানন্দ, ভক্তবৃন্দসহ আলালনাথে অপেক্ষা করছিলেন গৌরাঙ্গদেবের জন্য। আলালনাথের মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। পুরীর মন্দির থেকে পনেরো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আলালনাথের মন্দির। জগন্নাথের স্নানযাত্রার পর পনেরো দিন অর্থাৎ স্নানযাত্রা থেকে শুরু করে রথযাত্রা পর্যন্ত জগন্নাথদেব দর্শন বন্ধ থাকে। সেই সময় গৌরাঙ্গদেব পনেরো দিন আলালনাথে অবস্থান করে প্রতি দিনই বিষ্ণু দর্শন করতেন। তাই দক্ষিণ দেশে যাবার পূর্বে গৌরাঙ্গদেব আলালনাথে এসে পৌছে গেলেন। যেন তীর্থপথে যাত্রার পূর্বে বিষ্ণুর অনুমতি নিতে এসেছেন। বিষ্ণু দর্শন করে আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে ভাবাবেশে মূর্ছিত হলেন। আলালনাথে বস্ত্র প্রসাদ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন গোপীনাথ। নিত্যানন্দসহ ভক্তগণও প্রেমানন্দে কীর্তন করলেন। মধ্যাহ্নে গোপীনাথ প্রসাদান্ন ভিক্ষা করে নিয়ে এলেন। রাত্রি অতিবাহিত করবার পর অতি প্রত্যুষে গৌরাঙ্গদেব সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেলেন দক্ষিণ দেশের উদ্দেশ্যে। সমস্ত পথ চলতে চলতে উচ্চৈঃস্বরে শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে গেলেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কণ্ঠে তাঁর একই শ্লোক একই গান

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥

তাঁর সুরেলা কণ্ঠ, সঙ্গীতের মূর্ছনা, ব্যাকুলতা আর আর্তি গ্রামবাসীদের হৃদয়কে স্পর্শ করলো। তরুণ সন্ন্যাসীকে দর্শন করে শ্রদ্ধায় বিগলিত হল। আকৃষ্ট হল, আবিষ্ট হল তারা। গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে সঙ্গে তারাও কীর্তনানন্দে মত্ত হল। এমনি করেই গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন গৌরাঙ্গদেব।

যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥ চৈঃ চঃ।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গৌরাঙ্গদেব অবশেষে পৌঁছে গেলেন কূর্মস্থানে। বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে দ্বিতীয় অবতার কূর্ম অবতার। বিষ্ণু কূর্ম রূপে চিক্‌কোলের আট মাইল পূর্বে শ্রীকূর্মম মন্দিরে অবস্থিত। চিক্‌কোল বর্তমান ভিজাগাপত্তমের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। স্থানটি গঞ্জাম জেলায়। মন্দিরে কূর্ম দেবতার বিগ্রহ দর্শন করে দশ অবতারের কথা ভেবেই প্রেমে আত্মহারা হলেন। উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করতে করতে কূর্ম দেবতার স্তব স্তুতি করলেন। প্রেমাবেশে হেসে কেঁদেই আকুল হলেন গৌরাঙ্গদেব। স্থানীয় সমস্ত লোকজন বিস্মিত হল। গৌরাঙ্গদেবের দেহে প্রেম-বিকার লক্ষ্য করে সবাই জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করতে শুরু করলো কৃষ্ণনাম গান করতে করতে। কূর্ম গ্রামের একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ গৌরাঙ্গদেবকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন নিজ গৃহে। পরম শ্রদ্ধা ভরে তার পাদ প্রক্ষালন করে যথাযথ সেবা করলেন। কূর্ম গ্রামে এক রাত্রি অতিবাহিত করবার পর গৌরাঙ্গদেব আবার শুরু করলেন পদযাত্রা। পথ চলেন আর কৃষ্ণ গান গেয়ে যান। গ্রামের অধিবাসীরা দর্শন করে মুগ্ধ হয়। গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে সঙ্গে তারাও কীর্তন করতে শুরু করে।

কৃষ্ণ গান লোক মুখে শুনে অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥
এই মত পরম্পর দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণ নামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল॥ চৈঃ চঃ।

পথ চলতে চলতে পথের কথা ভুলে গেলেন গৌরাঙ্গদেব। এই তো তিনি চেয়েছিলেন। পথে পথে গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণনাম ধ্বনিত হতে থাকবে। কলি যুগে কৃষ্ণনামই তো একমাত্র সাধনা। এই সাধনার পথ দেখাতে দেখাতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চললেন। পথে দেবালয় এলে রাত্রিবাস করলেন সেখানে। গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করলেন। দিনান্তে ভিক্ষান্ন গ্রহণ। আবার প্রত্যুষে পদযাত্রা শুরু। এই ভাবে পথ চলতে চলতে সাক্ষাৎ হল বাসুদেব নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। তার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ, তার দেহ দিয়ে দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছিল। গ্রামের লোকজন তাকে লোকালয়ের বাইরে সরিয়ে দিয়েছে। তরুণ সন্ন্যাসীকে দর্শন করে কেঁদে পড়ল বাসুদেব। গৌরাঙ্গদেব তাকে কৃষ্ণনাম করতে বললেন। কৃষ্ণ নামই তার একমাত্র সহায়। এই নামের গুণে তার সব দুঃখ কষ্ট দূর হবে। বাসুদেব ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণনাম করতে শুরু

করলো। তাকে আশীর্বাদ করলেন গৌরাঙ্গদেব। তাঁর আশীর্বাদে বাসুদেবের দেহের জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হল। ধীরে ধীরে তার কুষ্ঠ আরোগ্য হল। পরম বৈষ্ণব হল বাসুদেব।

কূর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে গৌরাঙ্গদেব পৌঁছে গেলেন জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে। প্রায় চল্লিশ ক্রোশ অতিক্রম করতে হল। জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে নৃসিংহ মন্দির স্থাপিত হয়েছিল সিংহাচলমে। প্রাচীন যুগ থেকেই দৈত্যরাজ হিরণ্য কশিপু এই সিংহাচলমে রাজধানী স্থাপন করেছিল। হিরণ্য কশিপুর পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদের আকুল আরাধনায় ভগবান বিষ্ণু নরসিংহ রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। তিনি দৈত্যকুলরাজ হিরণ্য কশিপুকে বধ করে মুক্ত করেছিলেন পাপ থেকে। প্রহ্লাদ সিংহাসন লাভ করেই নরসিংহরূপী ভগবান বিষ্ণুর বিগ্রহ স্থাপন করে মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। সে মন্দির সৃষ্টির ইতিহাস আর নেই। ভক্ত প্রহ্লাদ যে মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন কালের কবলে পড়ে সে মন্দির ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তবে পাহাড়ের ওপরে চোলবংশীয় রাজা কুলোতুঙ্ নতুন মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন ১০৯৮—৯৯ সনে। কথিত আছে, সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের স্থানেই চোল রাজা নতুন করে মন্দির স্থাপন করেছিলেন। পরে এই মন্দির আবার জীর্ণগ্রস্ত হতেই ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে রাজা নৃসিংহদেব এই মন্দির সংস্কার করিয়েছিলেন। গৌরাঙ্গদেব অবশ্য রাজা নৃসিহদেবের নির্মিত মন্দিরই দর্শন করলেন। মন্দিরে পৌঁছবার জন্য পথ রয়েছে। হাজার খানেক সোপান বেয়ে পৌঁছতে হয় মন্দির প্রাঙ্গণে।

সিংহাচলম প্রাচীন কালের নাম। বর্তমান নাম সীমাচলম্। ত্রয়োদশ শতকের পর মন্দিরগুলোর আবার সংস্কার সাধনের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই ষোড়শ শতকের দিকে এই মন্দিরের উন্নতিকল্পে সাহায্য করেছিলেন বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবরায় আর রাজমহেন্দ্রীর রাজারা।

গৌরাঙ্গদেব মন্দির দর্শন করলেন। সমস্ত পথে ভক্ত প্রহ্লাদের গুণগান করলেন। বিষ্ণুরূপী নরসিংহ মূর্তি দর্শন করে স্তবস্তুতি করলেন। নৃত্য করলেন মন্দির প্রাঙ্গণে —কৃষ্ণনাম করতে করতে ভাবে বিভোর হলেন। মন্দির প্রাঙ্গণেই একজন ব্রাহ্মণ গৌরাঙ্গদেবকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন গৃহে। সেখানে রাত্রিবাস করবার পর গৌরাঙ্গদেব প্রত্যূষে জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র ত্যাগ করে যাত্রা শুরু করলেন। গভীর জঙ্গল; কোথাও ছোট ছোট পাহাড়…এমনি অসমান বন্ধুর পথ ধরে দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে পথ চললেন তিনি। সমস্ত পথ ধরে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণমন্ত্র, উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগান করতে করতে এগিয়ে গেলেন। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে পৌঁছে গেলেন গোদাবরীর

তীরে। গোদবরী দর্শন করে বিস্মিত হলেন তিনি। তাঁর প্রেমময় দৃষ্টিতে ভুল করলেন যেন। ভাবলেন—এই কি যমুনা ? নদীর তীরে গভীর বন দর্শন করে বিহ্বল হলেন তিনি--তবে কি এই সেই বৃন্দাবন ? যমুনা···আর বৃন্দাবন ভেবে ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণনাম গান করতে লাগলেন।

কিছুটা আশ্বস্ত হবার পর গৌরাঙ্গদেব গোদাবরী নদী অতিক্রম করে ওপারে স্নানের ঘাটে পৌছে গেলেন। নদীতে স্নান সমাপন করে স্থির হলেন। এই সেই গোদাবরী তীর্থ। ঘাটের অদূরেই বসলেন তিনি। আপন মনে কৃষ্ণগান গাইতে শুরু করলেন। ভোর হয়েছে, সূর্যের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে গোদাবরীর বুকে। এর মধ্যেই বাজনার শব্দ শুনে তাকালেন গৌরাঙ্গদেব। দোলায় চড়ে কে যেন আসছেন গোদাবরীতে স্নান করবার জন্য। সঙ্গে এসেছেন অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ। গৌরাঙ্গদেব বুঝলেন···ইনিই রামানন্দ রায়। বিদ্যানগর থেকে এসেছেন গোদাবরীতে স্নান সমাপন করবার জন্য।

গোদাবরী তীর্থই রাজমহেন্দ্রী। ১৪৫৪ সনে রাজমহেন্দ্রী উড়িষ্যার গজপতি বংশের অধিকারে এসেছিল। ১৪৫৮ সনে এই রাজ্যের একজন মন্ত্রী এই স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৪৭০ সনে কুলবর্গের মুসলমান রাজা রাজমহেন্দ্রী দখল করে নিয়েছিল। সম্ভবতঃ ১৫০০ সনে এই রাজ্য পুনরায় উড়িষ্যার হিন্দুরাজার অধিকারে এসেছিল। রামানন্দ রায়কে সম্ভবতঃ সেই সময় রাজা প্রতাপরুদ্রদেব রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। ১৫১৫ সনে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় প্রতাপ-রুদ্রদেবকে কোণ্ডাপল্লীর (মসলীপত্তনের নিকটে) নিকটে পরাভূত করেন। কিন্তু রাজমহেন্দ্রী তখনও প্রতাপরুদ্রদেবের অধিকারে ছিল।

এক সময় রাজমহেন্দ্রী তার সন্নিহিত প্রদেশ বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল। গোদাবরী গেজেটিয়ারে লেখা আছে—**Hiuen Tsang visited this Kingdom also. He described it as bring 1000 miles in circuit and its capital as some seven miles round. The once numerous Buddhist convents were in ruins and deserted at the time of his visit. Godvari Gazetteer. P. 20.**

রাজমহেন্দ্রীর সন্নিকটে ত্রিমন্দ নগরে অনেক বৌদ্ধ বসবাস করতেন। ত্রিমন্দ সম্ভবতঃ রাজমহেন্দ্রীর প্রায় আঠারো মাইল দক্ষিণে বর্তমান মন্দপল্লী। রাজমহেন্দ্রী-গোদাবরী তীর্থ হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থ। রাজমহেন্দ্রীর উত্তরে অখণ্ড গৌতমী গোদাবরী। রাজমহেন্দ্রীর কয়েক মাইল দক্ষিণে গোদাবরী দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে।

এই দুই ভাগের—এক ভাগের নাম বশিষ্ঠ গোদাবরী, দ্বিতীয় অংশের নাম গৌতমী গোদাবরী। কিছু দূর এগিয়ে উভয় নদীই বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

গৌরাঙ্গদেব ভালভাবে লক্ষ্য করলেন রায় রামানন্দকে। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যই তো তিনি এসেছেন দীর্ঘ পথ বেয়ে। ব্যাকুল হলেও ধৈর্য ধরতে হল। মনে প্রাণে এক অদ্ভুত আগ্রহ। নদীতে স্নান সমাপন করে রায় রামানন্দ তর্পণ করলেন। সমস্ত কার্য সম্পন্ন করবার পর উঠেই দেখলেন তরুণ সন্ন্যাসী। স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। এমন অদ্ভুত সন্ন্যাসী তো দেখা যায় না।

সূর্য শত সম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ পদ্মলোচন॥ চৈঃ চঃ।

রায় রামানন্দ যেন আকৃষ্ট হলেন এমন অপরূপ দর্শনে। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে। কাছে এসে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলেন।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

রায় রামানন্দ অবাক হয়ে তাকালেন গৌরাঙ্গদেবের মুখের দিকে। গৌরাঙ্গদেবের সতৃষ্ণ হৃদয়, রামানন্দকে যে তিনি আলিঙ্গন করতে চান! এই তো যথার্থ ভক্ত, সত্যিকারের রসিক; যার প্রথম দর্শনেই হৃদয়ে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তবু গৌরাঙ্গদেব জিজ্ঞাসা করলেন—তুমিই তো রায় রামানন্দ?

রামানন্দ রায় মৃদু হেসে বললেন—আমি তোমার দাস, আমি অধম শূদ্র।

এই কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গদেব বাহুযুগল দিয়ে বন্দী করলেন রামানন্দকে। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হতেই প্রেমাবেশে উভয়ই অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন ভূতলে।

স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিল।
দুঁহা আলিঙ্গিয়া দুঁহে ভুমিতে পড়িলা॥
স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্ গদ্ কৃষ্ণ বর্ণ॥ চৈঃ চঃ।

ঘটনা লক্ষ্য করে উপস্থিত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন না কিছুই। এই তরুণ তেজপুঞ্জ দেহধারী সন্ন্যাসী কেনই বা শূদ্র রামানন্দকে

আলিঙ্গন করে আকুল হয়ে ক্রন্দন করলেন! এই গম্ভীর মহাপণ্ডিত কেনই বা সন্ন্যাসীর স্পর্শে এমন মত্ত হলেন! এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন সবাই। এমন অবিশ্বাস্য দৃশ্যের কার্যকারণ বুঝতে পারলেন না বৈদিক ব্রাহ্মণগণ। বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা-পূর্ণ মানুষের সামনে উপস্থিত বলে গৌরাঙ্গদেব ও রামানন্দ উভয়েই ভাব সম্বরণ করে সুস্থির হলেন। সুস্থভাবে রামানন্দ গৌরাঙ্গদেবের কাছেই উপবেশন করলেন।

গৌরাঙ্গদেব মৃদু হেসে বললেন—তোমার গুণের কথা সার্বভৌম আমাকে বলেছিলেন। তিনিই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেছিলেন। তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে এই আশা নিয়েই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি। ভালো হয়েছে তোমার দর্শন পেয়ে।

রামানন্দ মৃদু হেসে বললেন—সার্বভৌম আমাকে কৃপা করেন। আমি তাঁর ভৃত্য সমতুল। পরোক্ষ ভাবে সর্বদাই তিনি আমার কল্যাণ কামনা করেন। তাঁর কৃপায় তোমার দর্শন পেলাম। আজ আমার মনুষ্য জনম সার্থক। সার্বভৌমের ওপরে তোমার কৃপা হয়েছিল নিশ্চয়ই। সেই চিহ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি।

গৌরাঙ্গদেব রায় রামানন্দের দিকে তাকাতেই রায় রামানন্দ বললেন—তুমি আমার মতো অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করে প্রেমাধীন করেছো। তুমি তো সাধারণ নও। তুমি যে অসাধারণ। তোমার সঙ্গে আমার তুলনা করা চলে না।

কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবক বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
তোমার কৃপায় তোমায় করায় সদয়॥
তোমার কৃপায় তোমার কথায় নিন্দাকর্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম॥ চৈঃ চঃ।

রামানন্দ বললেন—আমার সঙ্গে সহস্র ব্রাহ্মণ এসেছে। তোমার দর্শনে সবার মন দ্রবীভূত হয়েছে। দেখো, তোমার প্রভাবে সবার বদনে কৃষ্ণনাম। সবার অঙ্গ পুলকিত। কৃষ্ণনাম শুনে সবার নয়নে অশ্রু। তুমি তো সাধারণ সন্ন্যাসী নও!

আকৃতে প্রাকৃতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ।
জীবে না সম্ভাবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥ চৈঃ চঃ।

গৌরাঙ্গদেব হেসে ফেললেন—রামানন্দ, তুমি মহাভাগবতোত্তম। তোমার দর্শনেই সবার মন দ্রব হয়েছে। অন্যের কথা কি বলবো? আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। আমি এই মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ প্রেমে ভাসি।

অন্যের কি কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিই তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥

গৌরাঙ্গদেব বিনয় করে রামানন্দের স্তুতি করতেই রামানন্দ ততোধিক বিনয়ের সঙ্গে গৌরাঙ্গদেবের স্তুতি করতে শুরু করলেন। উভয়ে উভয়ের স্তুতি, উভয়ে উভয়ের গুণগানে মুগ্ধ হলেন দুজনেই। আনন্দিত হলেন, পুলকিত হলেন। এর মধ্যে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ গৌরাঙ্গদেবকে নিমন্ত্রণ করলেন। গৌরঙ্গদেবও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন বৈষ্ণব জেনে। রামানন্দকে হেসে বললেন গৌরাঙ্গদেব—তোমার সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করবার ইচ্ছে। কৃষ্ণপ্রেমের কথা শুনতে চাই তোমার কাছ থেকে। আবার যদি তোমার দর্শন পাই তাহলে আমার বাসনা পূরণ হবে।

রামানন্দ প্রত্যুত্তরে বললেন—আমি পামর। আমার চিত্ত দুষ্ট। তুমি তো পামর শোধিত করবার জন্যই এসেছো। তুমি এই স্থানে পাঁচ সাত দিন অবস্থান করে আমার দেহমন মার্জন করো। তাহলে হয়তো আমার দুষ্ট মন শুদ্ধ হবে।

বিদায়ের সময় আসতেই রামানন্দ কাতর হয়ে উঠলেন। আবার সাক্ষাৎ হবে এই আকাঙ্ক্ষা, এই আনন্দ নিয়ে বিদায় নিলেন রামানন্দ।

গৌরাঙ্গদেব বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করলেন। সন্ধ্যায় স্নানকৃত্য সম্পন্ন করে অপেক্ষা করছিলেন দারুণ আগ্রহভরে। ঠিক সেই সময় একজন ভৃত্যসহ রামানন্দ এসে হাজির হলেন। নমস্কার করতেই গৌরাঙ্গদেব আলিঙ্গন করলেন। উভয়েই বসলেন আসনে। দুজনেই কৃষ্ণকথা বলতে শুরু করলেন। গৌরাঙ্গদেব বললেন—রামানন্দ, তোমার মুখ থেকে কৃষ্ণকথা শুনতে চাই। তুমি রসিক…তুমিই বলতে পারবে! তুমিই আমার কৃষ্ণপ্রেমের তৃষ্ণা দূর করতে পারবে। তুমি বলো—জীব এ সংসারে জন্মলাভ করে নানা কর্ম করে। নানা কর্মে ব্যাপৃত হয়ে মত্ত হয়ে থাকে তার মধ্যেই। দয়ামায়া, ভালবাসা, সংসারের নানা আকর্ষণের বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে জীবন অতিবাহিত করে। এই বদ্ধ জীবের মুক্তির প্রয়োজন আছে।

রামানন্দ—বল জীবের সাধ্য কি? মানবজীবনের চরম লক্ষবস্তু কি? কোন্ সাধনায় সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছনো যাবে? শাস্ত্র বচনের দ্বারা তোমার ভাষ্য বল।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥ চৈঃ চঃ।

গৌরাঙ্গদেবের প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ বললেন—স্বধর্মাচরণই সাধনা আর বিষ্ণুভক্তিই সাধ্য বস্তু। বিষ্ণুপুরাণে এই কথা লেখা আছে। শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠানের কথাই বলতে চেয়েছেন। যে যে আশ্রমে রয়েছেন, সেই আশ্রমে সেই অবস্থায় থেকে নিষ্ঠা সহকারে কর্ম করলেই বিষ্ণুভক্তি লাভ হবে। কর্মযোগের কথাই বলতে চেয়েছে বিষ্ণুপুরাণে।

রামানন্দের এই কথায় তৃপ্ত হলেন না গৌরাঙ্গদেব। কর্মযোগই তো যথার্থ নয়।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার॥

রায় রামানন্দের কথা শুনে গৌরাঙ্গদেব বললেন—তুমি যা বললে—সে তো যথার্থ নয়। এ তো বাইরেবর কথা। কর্মযোগের সঙ্গে কৃষ্ণ ভজনার কি যোগাযোগ আছে বল?

তাই বললাম—এহো বাহ্য।

রায় রামানন্দ হেসে বললেন—কৃষ্ণে কর্মফল সমর্পণ করাই জীবের সাধ্য সার। কর্মযোগের আরো উৎকর্ষতায় দেখা যায় নিঃস্বার্থ কর্ম করা। আমি কর্তা নই, আমি শুধু কর্ম করি। কর্তা স্বয়ং ভগবান আমি তার অধীন। তাই আমি যা কিছু করি... সমস্ত কর্মই ভগবানের। তাই তার কর্মের ফলভোক্তাও ভগবান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অর্জুনকে এই কথাই বলেছেন।

এতেও কিন্তু তুষ্ট হলেন না গৌরাঙ্গদেব।

প্রভু কহে এহোবাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম ত্যাগ এই সাধ্য সার॥ চৈঃ চঃ।

গৌরাঙ্গদেবের কথায় রামানন্দ বিস্মিত হয়ে বললেন—স্বধর্ম ত্যাগই মানবের সাধনার শ্রেষ্ঠ কথা। এ তো গীতারই কথা। এই মহাবাণীতে দেখতে পাওয়া যায়—

সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষ বিষ্যামি মা শচঃ॥ গীতা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন সান্ত্বনা দিয়ে—অর্জুন, তুমি কি ভাবছো, তোমার ভয় কিসের…পাপ, পুণ্য এসব নিয়ে তুমি কেন বিভ্রান্ত? তোমার তো নিজস্ব কোন ধর্ম নেই। তুমি যাকে ধর্ম মনে করো, এ তো প্রকৃতিরই সহজ স্বাভাবিক ধর্ম। বিশ্বসংসারে যা কিছু ঘটছে, সব প্রকৃতিই করেছেন। তোমার নিজস্ব কোন কিছুই নেই। তাই তুমি সর্বধর্মের অতীত—আমারই পরা প্রকৃতি অর্থাৎ পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ সর্ব দ্বন্দ্বাতীত হয়ে আমারই শরণাপন্ন হও। এমনি শরণাগত হলেই আমি তোমার সর্ব কার্যের ভার গ্রহণ করবো। তুমি শুধু নিষ্ঠাসহকারে আমার—একান্ত ভাবে আমার হবে, তাহলেই তোমার সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করবো।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—এও তো বাহ্য। এ যে বাহিরের কথা। কারণ ভগবান ভক্তকে সর্ব কর্মের ফলরহিত হয়েই কর্ম করতে বলেছেন। সর্বোপরি ভগবান কার্যের ফলশ্রুতির অশ্বাস দিয়েছেন ভক্তকে। তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবো। এই প্রতিশ্রুতির পেছনে প্রলোভন রয়েছে। কর্ম করে কর্মফল সমর্পণের কথা নেই। তাই কর্মের বিচারবোধ, কর্মের ফলশ্রুতির প্রলোভন—এ কখনো সর্ব সাধ্য সার হতে পারে না।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান মিশ্রাভক্তি সাধ্য সার॥

সাধনার উচ্চ স্তরে পৌছে ভক্ত যদি অনুভব করেন—ভগবানই সংসারের সারবস্তু। এই জ্ঞান লাভ করলে ভগবান বিনা ভক্ত আর কাউকেই চান না। তাঁর তখন সমস্ত চাওয়া পাওয়ার সমাপ্তি ঘটে। ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ এই জ্ঞান ভক্তকে আর ভাবতে হয় না। তখন সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে আমাকে শরণ করো—এই আহ্বানের প্রয়োজন থাকে না। তখন তো ফলশ্রুতির কোন আশ্বাসের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের চরণই

তো তার একমাত্র সাধ্য। গীতায় লেখা আছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভুতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরায়॥ গীতা

যে ভক্ত ব্রহ্মভাবসম্পন্ন, অন্তরাত্মা আবির্ভূত আনন্দপ্রাপ্ত হন, তিনি প্রাপ্ত বস্তু নাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তিনি সর্বভূতের সুখ ও দুঃখ নিজের সুখ দুঃখের ন্যায় দর্শন করেন, এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি লাভ করেন। দীর্ঘ সাধন ভজনের ফলেই এই ভক্ত সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করেন।

গৌরাঙ্গদেব কিন্তু নীরব হয়ে রইলেন। এ ব্যাখ্যাও তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারলো না। তাই তিনি বলেন…এহো বাহ্য। এও বাইরের কথা, এ ছাড়া অন্য কি আছে বলো!

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সর্ব সাধ্য সার॥

রামানন্দ বোঝালেন—ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য জ্ঞান। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য জ্ঞানসম্পন্ন। এই জ্ঞানের জন্য ঈশ্বরকে ভজনা করা যথার্থই বাহ্য। তবে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি অর্থাৎ ভগবানকে ভক্তি শুধু ভগবানের জন্য। জ্ঞান বুদ্ধির কোন প্রয়োজন নেই। ভগবানকে শুধু ভক্তি…অহৈতুকি ভক্তি। ভগবান, তোমার স্বরূপ, তোমার ঐশ্বর্য মহিমা জানবার জন্য আমার কোন চেষ্টা নেই, প্রয়োজনও নেই। তোমার আদেশ আমি কায়মনবাক্যে শুনবো, তোমাতে যে সব মহাজন স্থিত আছেন তাঁদের আদেশ উপদেশ অনুসরণ করবো। তারপর তুমি আমার হয়ে যাবে। ভক্তের এই সাধনায় শ্রদ্ধা ভক্তির ইঙ্গিত রয়েছে।

গৌরাঙ্গদেব একথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। তবু তিনি আরো জানতে চান।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব সাধ্য সার॥

গৌরাঙ্গদেব বললেন—এ পর্যন্ত তুমি যা কিছু বলেছিলে সেগুলো সবই বাহ্য। তবে জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ, এর আগে পর্যন্ত যা কিছু বলেছো, তাতে মানবের অমিত্বের পরিণাম চিন্তা, আমিত্বের মঙ্গল চিন্তার সূক্ষ্মতম আভাস রয়েছে। তবে জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে এ সবের লেশ মাত্র নাই। ভগবানের জন্যই ভগবানের সেবা…একে অস্বীকার করা যায় না। গৌরাঙ্গদেব তাই বললেন—'এহো হয়'। কিন্তু এর পরেও কিছু রয়েছে—যা তিনি জানতে চান।

রামানন্দ বললেন—প্রেম ভক্তির কথা। ভগবানকে সুখী করবো, তাঁর প্রীতি সম্পাদন করবো, এই আকাঙ্ক্ষাই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ চৈঃ চঃ।

এই পর্যন্ত সাধ্যবস্তু সম্পর্কে যতদূর আলোচনা হয়েছে, সেই স্তবকে বলা যায় তস্যৈবাহং' বা আমি তাঁহার বা আমি তোমার। আলোচনার এখনকার স্তর—মামৈ বাসৌ বা সে আমার বা তুমি আমার।

কৃষ্ণপ্রীতি ইচ্ছাই প্রেম। অহৈতুকি ভক্তির সঙ্গে কৃষ্ণের প্রীতির ইচ্ছার সমন্বয়—প্রেমভক্তি।

রায় রামানন্দ তাঁর স্বরচিত শ্লোক থেকে উদ্ধৃতি দিলেন—

নানোপচার কৃত পূজনমার্ত্ত বন্ধোঃ
প্রেম্নৈ ভক্ত হৃদয়ং সুখ বিদ্রুতিং॥
যাবৎ ক্ষুদস্তিজঠরে জঠরা পিপাসা।
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্থ ভক্ষ্য পেয়ে॥

ক্ষুধা নেই তো—ভোগ হবে কি করে? জঠরে যদি ক্ষুধা তৃষ্ণা তীব্র থাকে, তখন ভোক্ষ্য দ্রব্য গ্রহণ করলে আনন্দ হয়। কৃষ্ণলাভের ক্ষুধা, পিপাসায় আর্ত হলেই তো প্রেমার্তি দেখা দেয়। তখনই কৃষ্ণানুভূতি তীব্র হয়ে দর্শন হয়।

রামানন্দ বললেন—

কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতাযতিঃ।
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে॥
তত্রলোল্য মপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটি সুকৃতের্ণলভ্যতে॥

কৃষ্ণভক্তিরস আস্বাদনের বস্তু। কৃষ্ণে মতি লাভ করতে মূল্য দিতে হয়। সে মূল্য হল তীব্র লালসা। কৃষ্ণসেবার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা। লোভ তীব্র হলেই বস্তু লাভ হয়। আর সেই লোভ বা লালসা জাগে কৃপা হলে। কোটি জন্মের সুকৃতি থাকলেও এ লালসা লাভ করা যায় না। সেবা দিয়ে প্রীতি দিয়ে কৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করবার তীব্র ইচ্ছাই প্রেমভক্তি। আর এই লালসাই প্রেমভক্তির মূল স্বরূপ।

গৌরাঙ্গদেবের চোখেমুখে আনন্দের আভা। তবু ইতস্তত, আরো জানতে চান। সাধ্য বস্তু কি? এ সব কথায় তো মন ভরতে চাইছে না। তাই গৌরাঙ্গদেব বললেন—

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব সাধ্য সার॥ চৈঃ চঃ।

তুমি আমার একমাত্র প্রভু, আমি তোমার দাস। তোমাকে সেবা করবার জন্য আমি সেবক। তোমার বহু দাস, বহু সেবক থাকতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি তোমাকে সেবা না করলে তোমার সেবা যথার্থভাবে হয় না। আমার সর্বক্ষণ মনে হয়, আমার মতো এমন করে সেবা তো কেউ করে না, করতেও পারে না। তাই সর্বক্ষণই ভয়—আমার সেবা যেন যথার্থ ভাবে সম্পন্ন হয় না। কোথায় যেন অভাব, কোথায় যেন ত্রুটি। এই সংশয় আমার মনকে ঘিরে রাখে বলে তোমাকে আরো নিবিড়ভাবে সেবা করতে চাই। ভগবানের প্রতি দাসের এই যে ভাব…একে বলা হয় দাস্যপ্রেম।

রামানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত থেকে উদ্ধৃত করেন। অম্বরীষের প্রতি ঋষি দুর্বাসার উপদেশচ্ছলে বলেন—যার কথা শোনামাত্রই যে ভক্ত নির্মল হয়, পবিত্র হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসানুদাসের আর কি প্রাপ্তির বাকি থাকে?

রায় বললেন—মানবজীবনের এই সাধ্য।

মৃদু মৃদু হেসে গৌরাঙ্গদেব বললেন—হ্যাঁ, এও হয় তবে উত্তম নয়। রামানন্দ,

তোমার কথায় লালসা যে বেড়েই যাচ্ছে। তুমি আরো কিছু বল—যাতে আমার মন ভরে যায়।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার॥

গৌরাঙ্গদেবের কথায় রামানন্দ বললেন—সখ্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার। বন্ধু-সখা এ সম্পর্কে অত্যন্ত মধুর। সখা বনের ফল আহরণ করে এনেছে। আস্বাদন করে দেখলো—মিষ্টফল। এ তো মিষ্ট ফল···সে যে একা খেতে পারে না। সামান্য হলেও অর্ধেকটা খাবার পর উচ্ছিষ্ট ফল তুলে দেয় কৃষ্ণের মুখে। বলে—ভাই কানাই, এ তো মিষ্ট ফল একা কি করে খাবো তোমাকে না দিয়ে। তাই তোমার জন্য নিয়ে এসেছি। কৃষ্ণ সেই উচ্ছিষ্ট ফল পরম তৃপ্তিসহকারে খান। কৃষ্ণকে তুচ্ছদ্রব্য না দিয়ে তৃপ্ত হন না সখা সুদাম। এতে সম্ভ্রমজ্ঞান নেই, সঙ্কোচ নেই। উচ্ছিষ্ট খাওয়ানোর জন্য বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ নেই। খেলায় হারবার পর কৃষ্ণকে যেমন সখারা কাঁধে তুলে নেন বিনা দ্বিধায়, আবার তেমনি খেলায় হারিয়ে দেবার পর সখা আবার বিনা দ্বিধায় কৃষ্ণের কাঁধে চড়ে বসেন। সখ্যপ্রেমে উচ্চ নীচ ভেদ নেই; সবাই সমান। কৃষ্ণকে না দেখলে ব্যাকুল হন ব্রজরাখালগণ। তাঁর দীর্ঘ অদর্শনে কাঁদেন। তাঁর অভাবে হাহাকার করেন। সখ্যপ্রেমের পরিচয় এইখানেই।

শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন—সম্পূর্ণ মায়া দ্বারা আশ্রিত শ্রীদামাদি গোপগণ যশোদানন্দন গোপালের সঙ্গে সবাই খেলাধুলা করেন। একসঙ্গে গোচারণে যান। সবাই অভেদ, নিজদেহ আর কৃষ্ণদেহ অভেদ হয়ে যায়। প্রভু ও দাসের সম্বন্ধের মধ্যে সর্বক্ষেত্রেই ব্যবধান রয়ে যায়। সঙ্কোচ আসে। সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক হয় না। কৃষ্ণকে যদি সর্বশক্তিমান ত্রাতা মনে করা হয়, তাহলে সেবা কখনো সর্বসম্পূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু সখ্যপ্রেমে সঙ্কোচের স্থান নেই। সখ্যপ্রেমে অভেদ বুদ্ধি। নিজদেহে ও কৃষ্ণদেহে অভেদ নেই। কার দেহ—কারই বা চরণ। গায়ে পা লাগলে সঙ্কোচ নেই। চাঞ্চল্য নেই, পাপবোধও নেই। যেমন নিজের গায়ে পা লাগলে ভাবান্তর হয় না, গায়ে পা ঠেকলেও ঠিক তেমনি। কে কার কাঁধে উঠেছে খেলাচ্ছলে, কে কার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেছে—এ বিচারবুদ্ধি থাকে না। সখ্য-প্রেমকে গৌরাঙ্গদেব বললেন—এই সখ্যপ্রেম উত্তম। তবু আরো কিছু বলবার রয়েছে।

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব সাধ্য সার॥

গৌরাঙ্গদেবের কথা শুনে রায় রামানন্দ বললেন বাৎসল্য প্রেমের কথা। সখ্য-প্রেমে—সখা আর কৃষ্ণে অভেদ। উভয়েই সমান সমান। তবু ভক্ত কৃষ্ণের সখা, যার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করা যায়। সুখদুঃখের কথা বলা যায়, অনুভব করা যায়। কিন্তু বাৎসল্য প্রেমে কৃষ্ণ ছোট, যেন দুর্বল, দীনহীন। বাৎসল্য প্রেমে—তাড়নে, শাসনের স্নেহের বন্ধনে বন্দী হয়ে থাকতে হয়। ভক্তকে বৃহতের ভূমিকা নিয়ে ভগবানকে ক্ষুদ্রতম করে বুকের মাঝখানে লুকিয়ে রাখতে চান। মা যশোদা জানতেও পারেন না—কে তার গৃহে এসে ধরা দিয়েছে সন্তানরূপে। মা বলে বুকের মাঝখানে আশ্রয় নিয়েছে।

গোপরাজা নন্দ জানতেন না যে এই বালক তাকে পিতা বলে সম্বোধন করবে? এই শিশুই কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ ধরে সখাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে। নন্দ ঘোষ গোয়ালা। গোয়ালার ছেলে গরু চড়াতে যাবে না কেন? তাকে তাই গরুর পাল নিয়ে মাঠে যেতে বলেন বিনা সঙ্কোচে। যশোদা মা—মায়ের প্রাণ সম্পূর্ণ আলাদা। বনে মাঠে গোপালকে পাঠাতে তার মন চায় না। নানা অপত্তি সত্ত্বেও যখন ছেড়ে দিতে হয় তখন ভয়, আশঙ্কা, নানা সাবধানতা। দূর বনপথে একাকী যেতে নিষেধ, রৌদ্রে ঘুরে বেড়াতে নিষেধ। খেলায় মেতে থেকে সময়মতো খাবার খেতে যেন ভুল না হয় সেজন্য স্মরণ করিয়ে দেয়া। মা সন্তানকে সর্বক্ষণ চোখের সামনে রেখেও যেন শান্তি পান না।

দধিভাণ্ড ভেঙেছেন গোপাল, ননী চুরি করেছেন। মা মারবেন, বেঁধে রাখবেন। মাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছেন গোপাল। যশোদাও তাকে ধরবার জন্য ছুটছেন। কিছু দূরে গিয়েই ধরে নিয়ে এসেছেন। মায়ের হাতে লাঠি। ভয় পেয়ে কৃষ্ণ কাঁদছেন, চোখ মুছতে মুছতে চোখের চার পাশটা অঞ্জন লিপ্ত। ভীত কৃষ্ণকে দেখে মায়া হয়েছে যশোদার। লাঠি ফেলে দিয়ে যশোদা দড়ি দিয়ে বাঁধতে চাইলেন কৃষ্ণকে। ভক্ত বাঁধতে চাইছেন ভগবানকে। যাঁর অন্তর বাহির নেই, পূর্ব পর নেই, যিনি নিজেই জগন্ময়, যিনি নিজেই অব্যক্ত, যিনি স্বপ্রকাশ, তাঁকে সাধারণ পুত্র মনে করে যশোদা বেধে রাখতে চাইছেন সাধারণ রজ্জুর সাহায্যে। কিন্তু বাঁধতে পারলেন না। গোপীদের গৃহ হতে সঞ্চিত রজ্জুর সাহায্যে বাঁধতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। যশোদা বিস্মিত, লজ্জিত হন। ক্লান্ত হলেন। মায়ের কষ্ট দেখে স্বয়ং কৃষ্ণ বন্দী হলেন।

ভক্তিবশ হলেন কৃষ্ণ। মায়ের স্নেহ, ভালবাসার কাছে বন্দী হলেন। বন্দী হয়ে তুষ্ট হলেন ভগবান। এই হল বাৎসল্য প্রেম।

রায় রামানন্দের কথা শুনে গৌরাঙ্গদেব বললেন—তুমি ঠিকই বলছো। বাৎসল্য প্রেম উত্তম সাধ্য। তবু সর্বোত্তমের সন্ধান আমি পাইনি। আমি তারই সন্ধান চাই তোমার কাছ থেকে।

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাভাব প্রেম সাধ্য সার॥

গৌরাঙ্গদেবের প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ বললেন—কান্তাপ্রেমই মানব জীবনের সাধ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের উদ্দেশ্যে উদ্ধব বলেছেন—রাম উৎসবে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে আবদ্ধ গোপীগণ যে প্রসাদ লাভ করেছিলেন—পদ্মিনী সুরললনাগণের শ্রেষ্ঠা নারায়ণ বক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষ্মীদেবীও সেই প্রসাদ লাভ করতে পারেননি। কারণ, নারায়ণের লক্ষ্মীর ঈশ্বরবুদ্ধি, গোপীগণের আত্মবুদ্ধি। এই গোপীভাবই সাধনার তৃতীয় অবস্থা। একমাত্র গোপীগণই বলতে পারেন—তুমিই আমি। অনেকের মধ্যেই তুমি আমার। একান্তই আমার। রাসে কৃষ্ণ হারা গোপীগণ প্রত্যক্ষ করেছেন।

কান্তাপ্রেমই সর্বসাধ্য। গুণাধিক্যেও শ্রেষ্ঠ, স্বাদাধিক্যেও। রায় রামানন্দ বললেন কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য সাধনার বহুবিধ উপায় রয়েছে। তেমনি কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য অনেক প্রকার। ভক্ত যে রসের রসিক, সেই রসই তার কাছে সর্বোত্তম। তবে গভীর ভাবে বিচার করলে তারতম্য উপলব্ধি করা যায়। যেমন—

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গননে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্যে বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে রসে॥ চৈঃ চঃ।

শান্তের গুণ দাস্যে, দাস্যের গুণ সখ্যে, সখ্যের গুণ বাৎসল্যে আর বাৎসল্যের গুণ পর্যবসিত হয় মধুরে। শান্তের যেমন একটিমাত্র গুণ—সে গুণ কৃষ্ণ নামে নিষ্ঠা বা কৃষ্ণ-

নিষ্ঠা। দাস্যের দুটি গুণ—কৃষ্ণনিষ্ঠা তো আছেই, তার ওপরে সেবানিষ্ঠা। সখ্যে তিনটি গুণ—দাস্যের দুটি গুণ। আর তৃতীয়টি—অসঙ্কোচ-অভিন্ন মনন। বাৎসল্যের চারটি গুণ। সখ্যের তিন গুণ ছাড়াও আরো একটি গুণ—গভীর মমত্ববোধ। আর মধুরের পাঁচটি গুণ বর্তমান। বাৎসল্যের চারটি গুণ। অপর একটি—দেহ-প্রাণ, মন দিয়ে কৃষ্ণসেবা। রায় রামানন্দ বললেন

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ চৈঃ চঃ।

গৌরাঙ্গদেব আনন্দে আত্মহারা হলেন। রামানন্দের দিকে তাকিয়ে ভাবে গদ্ গদ্ কণ্ঠে বললেন—তুমি যা বলেছো, সাধনায় শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের আলোচনা করেছো। কিন্তু তুমি রসিক···তোমার কাছ থেকেই রসের খবর পেয়েছি—

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥ চৈঃ চঃ।

অবাক হয়ে গেলেন রামানন্দ। গৌরাঙ্গদেবের জিজ্ঞাসার যেন আর নিবৃত্তি নেই।

রামানন্দ বললেন—এর পরেও তুমি আরো কিছু জানতে চাও। আর কি শোনাব তোমাকে। ত্রিভুবনে এমন রসিক আছেন যিনি এত উৎকণ্ঠা—এত জিজ্ঞাসা নিয়ে আসবেন ? তবু আমি যতটুকু জানি তাই বলবো—

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥ চৈঃ চঃ।

কান্তা প্রেম সর্বোত্তম সন্দেহ নেই। কিন্তু কান্তাপ্রেম সাধনার বস্তু হলেও···তার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—তোমার কথা শুনতেও সুখ পাই। তোমার মুখ থেকে যেন অমৃতের ধারা বয়ে চলেছে। আমি সেই অমৃত ধারা পান করে চলেছি। কিন্তু এই অমৃত পানে পিপাসা যে আরো বৃদ্ধি করছে। এ কি দুঃসহ বেদনা!

গৌরাঙ্গদেব বললেন—রাধার প্রেম যদি সাধ্য শিরোমণি হয়, তবে শ্রীমদ্ভাগবতে কি লেখা আছে ? কৃষ্ণ অন্যান্য গোপীগণকে লুকিয়ে শ্রীমতী রাধিকাকে সঙ্গে করে রাসমণ্ডল ত্যাগ করেছেন। এই যে গোপীগণের ভয়, এই যে অন্যাপেক্ষা, একে কি করে প্রেমের গাঢ়তা বলবো ? রাধার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণ গোপীগণকে ত্যাগ করেছেন, উপেক্ষা করেছেন—এর অর্থ কিন্তু বোঝা যায়। এতে কিন্তু রাধা প্রেমের উৎকর্ষতা অনুভব করা যেতো। রামানন্দ…আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার কাছ থেকে রাধাতত্ত্ব আমি বুঝতে চাই।

রামানন্দ হেসে বললেন

রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধা প্রেমের নাহিক উপমা ॥
গোপীগণের রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরেন বিলাপ করিয়া ॥ চৈঃ চঃ

রামানন্দ বললেন—রাধা প্রেমের মহিমা অনুভব করা দুঃসাধ্য। তবু শাস্ত্রগত প্রমাণ রয়েছে রাধার প্রেমই সাধ্য শিরোমণি। রাসমঞ্চ থেকে শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই গোপীগণের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন রাধার জন্য। জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে এ সম্পর্কে লেখা রয়েছে—

কংশারি রপি সংসার বাসনা বদ্ধ শৃঙ্খলম্।
বাধা মাধবায় হৃদয় তত্যাজ ব্রজ সুন্দরী ॥ গীতগোবিন্দ

অর্থাৎ নিজেকে সংসার বাসনার বন্ধনে আবদ্ধ রাখবার জন্য শৃঙ্খল যে শ্রীরাধিকা, কংসারি তাকেই হৃদয়ে রেখে ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করলেন। অর্থাৎ—কংশ আত্ম সুখ কাম বাঞ্ছা, তার অরি শ্রীকৃষ্ণ; তিনি আপন সম্যক বাসনার সারভূতা যে শ্রীরাধা, তার কথা চিন্তা করতে করতে ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করলেন। গীতগোবিন্দের এই তত্ত্বই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিভাত হয়েছে।

রামানন্দ বললেন—

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিলে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥

রাসমঞ্চে গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ, প্রতিটি গোপীর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণের অবস্থিতি। আর রাধিকার পাশে একটি মূর্তি। সর্বত্র সমভাব, তবু রাধিকা অসামান্য। সাধারণ প্রেমের সমতা সর্বত্র, কিন্তু রাধা প্রেম স্বতন্ত্র। তাই স্বতন্ত্রপ্রেমী অভিমানে রাসমঞ্চ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাস লীলা।
রাস লীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥
তাহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিত্তে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥

কৃষ্ণ উতলা, অন্বেষণ করছেন ব্যাকুল হয়ে রাধিকার। যাঁর অন্বেষণ করে বিশ্ব-চরাচর, তিনিই অন্বেষণে তৎপর। কোথায় শ্রীরাধিকা, কোথায় কোন্ স্থানে? মুখে রাধার নাম, হৃদয়ে রাধা, রাধার বিরহে সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন বিরহতাপে তাপিত। এই এক অপরূপ চিত্র, ভগবানের প্রীতি সম্পাদন করতে না পারা, সেবা করতে না পেরে ভক্তগণ ব্যথিত উৎকণ্ঠিত, ভগবানও ততোধিক ব্যথিত ও উৎকণ্ঠিত। তাই রাধার বিরহ বেদনা শত শত গুণ হয়ে কৃষ্ণের বুকে বেধেছে। তাই কৃষ্ণ রাধার অন্বেষণ করেছেন। রাধার অভাব—ভক্তের অভাবে ভগবান স্থির কি করে থাকবেন? এই অভাব বোধই…এই বিরহ বেদনা বোধই রাধা প্রেমের মূল কথা।

প্রভু কহে যাহা লাগি আইলাম তোমা স্থানে।
সেই সব রসতত্ত্ব বস্তু হইল জ্ঞানে ॥
এবে সে জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবারে মনে হয় ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ, রাধার স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্বরূপ ॥ চৈঃ চঃ।

গৌরাঙ্গদেব অনুনয় করে বললেন—তুমি তত্ত্বজ্ঞ, কৃপা করে এই তত্ত্ব কথা আমার

কাছে বর্ণনা করে বল। তুমি ছাড়া এমন রসিক ত্রিভুবনে আর কেউ নেই।

রামানন্দ করজোড়ে বললেন—প্রভু, আমি কিছুই জানি না। তুমিই সব। তুমি যেমন আমাকে বলাও, আমি তাই বলি। তোমার শিক্ষায় আমি পাঠ করি। তুমিই আমার সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥ চৈঃ চঃ।

গৌরাঙ্গদেব হাসলেন রামানন্দের কথা শুনে। তিনি বললেন—এ সব তুমি কি বলছো। আমি যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী। ভক্তিতত্ত্বের আমি তো কিছুই জানি না। মায়াবাদে আমি ভাসি। সার্বভৌমের সঙ্গে থাকবার ফলে আমার মন নির্মল হয়েছে। তাঁকেই আমি কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বকথা জানাতে চেয়েছিলাম। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন।

তিঁহো কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণ কথা।
সবে রামানন্দ জানে তিঁহো—নাহি এথা॥ চৈঃ চঃ।

তাই তো আমাকে নীলাচল থেকে আসতে হয়েছে বিদ্যানগরে গোদাবরী তীর্থে। তোমার কথা শুনে তোমার কাছেই এসেছি। তুমি আমাকে স্তুতি করছো কেন? আমি সন্ন্যাসী বলে? ব্রাহ্মণ হোক, সন্ন্যাসী হোক, শূদ্র হোক যিনিই কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ তিনিইআমার গুরু। তুমি আমাকে সন্ন্যাসী বলে বঞ্চনা কোরো না। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের কথা বিস্তারিতভাবে আমাকে শোনাও। আমার মনস্কামনা পূর্ণ করো।

গৌরাঙ্গদেবের কথায় রায় রামানন্দ বললেন—তুমি আমাকে যত কথাই বলো, আমি ঠিক চিনতে পেরেছি তোমাকে। আমি নট, তুমি সূত্রধার। তোমার ইচ্ছায় যা কিছু করতে বলো আমি তাই করি। তুমি আমাকে যেমন নাচাও আমি তেমনি নাচি।

আমার জিহ্বাগ্রে বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী।

মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥ চৈঃ চঃ।

রায় রামানন্দ বললেন—কৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান। সমস্ত অবতারের মূল কারণ তিনি। অনন্ত বৈকুণ্ঠে অনন্ত অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে চিদানন্দ ভগবান কৃষ্ণ। তিনি সর্বশক্তিসম্পন্ন, সর্বরসসম্পন্ন। ব্রহ্ম সংহিতায় বলা হয়েছে

ঈশ্বরঃ পরমকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণং॥

কৃষ্ণ বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। যে শক্তিমত্ততা জন্মায় তাকেই বলা হয় মদন। প্রাকৃত বস্তুতে যে মত্ততা বা কামনা জন্মায় সে প্রাকৃত মদন। প্রাকৃত বস্তুতে যে লালসা, সেই পার্থিব লালসার পরিসমাপ্তি ঘটে কাম্যবস্তু লাভের পর। তখন আর আস্বাদনেও নতুনত্ব থাকে না কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তুতে যে মত্ততা বা লালসা জাগায় সে অপ্রাকৃত মদন। অপ্রাকৃত বস্তুতে যে মত্ততা বা লালসা তার পরিসমাপ্তি ঘটে না। কাম্যবস্তু লাভের পরেও আস্বাদন নতুন নতুন রূপে, নতুন নতুন ভাবে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম কামনা যতই আস্বাদিত হয়, লালসা বৃদ্ধি পায় শত শত গুণে।

এই লালসা বা কামনার মূল উৎসকে বৈষ্ণবগণ বলেন কামবীজ। এই কাম-বীজও কামগায়ত্রী উপাসনার বিষয়বস্তু। সমস্ত বিশ্বচরাচরের চিত্তাকর্ষকই তো সাক্ষাৎ মদন। এই মদনই সমস্ত রসের আশ্রয় স্বরূপ। এই রস আস্বাদন বা সম্ভো-গেচ্ছাকেই বলা হয় শৃঙ্গার। আর সম্ভোগেচ্ছার সার্থকতার নাম শৃঙ্গার রস। শৃঙ্গার রসের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। তার অধিষ্ঠাতৃদেবতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

রায় রামানন্দ বললেন—সমস্ত রসের বিষয় আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। এই সমস্ত রসের রসামৃত নানাভাবেই পান করেন ভক্তগণ। কৃষ্ণ সর্বচিত্তহর। বিশ্বচরাচরের সব কিছুর চিত্তহরণ করেন তিনি। সবার চিত্তহরণ করে তিনি আত্ম চিত্তহরণ করেন। তখন তিনি আপন রূপে আপনি আকৃষ্ট হয়ে আপনি বিভোর। এই আকর্ষণে তিনি নিজেকেই নিজে আলিঙ্গন করতে চান।

আপনা মাধুর্যে হয়ে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

এই তো সংক্ষেপে কৃষ্ণের স্বরূপ প্রকাশ করলাম। এবার রাধাতত্ত্বের কথা বলবো

সংক্ষেপে।

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি। সেই অনন্তশক্তির মধ্যে তিনটিই প্রধান। সেই শক্তিগুলির চিৎশক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি। এই শক্তিগুলির স্বরূপশক্তি যথাক্রমে…অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। আবার সবার ওপরে রয়েছে অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি।

সচ্চিদানন্দময়কে বলা হয় কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। এই স্বরূপশক্তি আবার তিন প্রকার। আনন্দাংশের শক্তির নাম হ্লাদিনী, সদংশের পরিচয় হল সন্ধিনী, আর চিদংশের নাম সম্বিতশক্তি। কৃষ্ণকে আহ্লাদিত করে রাখবার শক্তিতে আহ্লাদিনী। এই অপারশক্তি আস্বাদনে কৃষ্ণ আপনাতে আপনি বিভোর। এই আস্বাদন রূপ সুখ নিজে উপভোগ করেন, ভক্তগণকেও আস্বাদন করান। ভক্তগণকে সুখ দেবার জন্য যে শক্তি, হ্লাদিনীই তার কারণ স্বরূপ। এই 'হ্লাদিনীর সার অংশের নাম' প্রেম। এই প্রেমই হল আনন্দ চিন্ময় রস। প্রেমের সারভাগ মহাভাব। শ্রীরাধা এই মহা-ভাবরূপা। বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রে রাধাপ্রেমের উৎকর্ষে দেখা যায় প্রেম। প্রেম ক্রমান্বয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ থেকে ভাব, ভাব থেকে সর্বশেষে মহাভাবে পরিণত হয়।

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেমনাম।
আনন্দ চিন্ময়রূপ রসের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥ চৈঃ চঃ।

আনন্দ চিন্ময় রসই প্রেম। প্রেম পুষ্ট হতেই স্নেহ জন্মলাভ করে। স্নেহ অর্থ প্রেমের উৎকর্ষ, প্রেম উপলব্ধির উৎকর্ষ। স্নেহের স্বভাবই আপনা হৃদয়কে বিগলিত করা। সেই বিগলিত-দ্রবীভূত প্রেম যখন নিত্য নূতন মাধুর্যে উল্লসিত হয়; আর সেই উল্লাসকে গোপন করবার প্রবণতা আসে তখনই জন্মলাভ করে 'মান'। মান তারপর ধীরে ধীরে পরিণত হয় প্রণয়ে। সম্ভ্রমহীনতা, বিশ্বাসই প্রণয়ের স্বরূপ। প্রণয় যখন প্রিয়তমের জন্য আপনার সকল দুঃখকে সুখ বলে অনুভব করে, তখনই

রাগের উৎপত্তি হয়। রাগের পথে প্রিয়তম যখন নিত্যই নতুনরূপে অনুভূত হয়, তখন তাকে বলা হয় অনুরাগ। অনুরাগের চরম অবস্থার নাম ভাব। অনুরাগ যখন সকল বৃত্তির আশ্রয়রূপে বিকশিত হয়ে আপনামধ্যে আপনিই সার্থকতা প্রাপ্ত হয় তখন তাকে বলা হয় ভাব। ভাবের পরম পরাকাষ্ঠাই মহাভাব। মহাভাব আবার দুই প্রকার। রূঢ় মহাভাব ও অধিরূঢ় মহাভাব। রূঢ় মহাভাবের অধিকারী শ্রীরাধিকার সঙ্গিনী কায়ব্যূহ স্বরূপা সখীগণ। অধিরূঢ় মহাভাবের একমাত্র অধিকারী শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধা যখন বিরহ ব্যথায় ব্যাকুলা, তখনই অধিরূঢ় মহাভাবের নাম মোদন বা মোহন। মোহন অবস্থাভেদে দিব্যোন্মাদ নামে উল্লেখ করা হয়।

সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তায়ে প্রেমনাম কয়।

প্রেম পুষ্ট হতেই মহাভাবে বিকশিত হয়ে যে নিরবচ্ছিন্ন মিলনানন্দে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন, তাকেই বলা হয় মাদন। শ্রীরাধিকা এই মহাভাবের অধিকারী দেবী।

রায় রামানন্দ রাধাতত্ত্বে প্রেম আস্বাদনের ধারাবাহিকতার নির্দেশ দিলেন। রাধাতত্ত্ব এই রাধিকা প্রেমের স্বরূপ দেহ—কৃষ্ণের প্রেয়সী, মহাভাবরূপা চিন্তামণি সার। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করাই তার প্রধান কার্য। মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ, ললিতা, বিশাখা সখীগণ রাধার কায়ব্যূহ স্বরূপ। রায় রামানন্দ শ্রীরাধার দেহকান্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন

শ্রীরাধার দেহ কৃষ্ণের সৌরভে পরিপূর্ণ, তাই দেহকান্তি উজ্জ্বল। সেই উজ্জ্বল দেহকান্তিকে করুণার অমৃত ধারায় অবগাহন করায় শ্রীরাধিকা করুণাময়ী। আবার সেই দেহকে তারুণ্যের অমৃত ধারায় দ্বিতীয়বার অবগাহন করায় রাধিকা অনন্ত-যৌবনা। সেই অনন্তযৌবনা দেহকে শেষ বার লাবণ্যের অমৃত ধারায় স্নান করায় শ্রীরাধিকা চিরলাবণ্যময়ী। তারপর সেই করুণাময়ী অনন্তযৌবনা…চিরলাবণ্যময়ী শ্রীরাধিকার উজ্জ্বল দেহকান্তির সর্বাঙ্গে কৃষ্ণ অনুরাগ, মান-প্রণয় প্রেমরূপ মণি-মাণিক্যের মতো বসন-ভূষণে সজ্জিত। তারপর কৃষ্ণলীলা রূপ সখী বেষ্টিত শ্রীরাধা কৃষ্ণ গুণগানে বিভোর। শ্রীরাধিকার সেই রূপ, সেই দেহ দ্বারা কৃষ্ণকে নিরন্তর সেবায় রত।

রায় রামানন্দ বললেন—এই অপরূপা শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমের আকর। অনুপম রূপলাবণ্যে পরিপূর্ণ তার কলেবর। এই দেহ লাভের সৌভাগ্য বাঞ্ছা সত্য-

ভামার, রুক্মিণীর। এই দেহ লাভের সৌন্দর্যগুণ বাঞ্ছা করেন স্বয়ং লক্ষ্মী, এই দেহে পতিব্রতা ধর্ম বাঞ্ছা করেন অরুন্ধতী। এমনি শ্রীরাধিকার স্বরূপ।

যার সদ্‌গুণের কৃষ্ণ না পায় পার।
তার গুণ গণিবে কেমন জীব ছার॥ চৈঃ চঃ।

গৌরাঙ্গদেব ব্যাকুল হলেন, প্রেমে বিগলিত হলেন রাধার স্বরূপ শ্রবণ করে। তিনি বললেন—রাধা কৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব তোমার মুখ থেকে শুনে জীবন সার্থক হল। এবার রাধা কৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব তোমার মুখ থেকে শুনবার আকাঙ্ক্ষা।

প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ রাধা প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়া দুঁহার বিলাস মহত্ত্ব॥ চৈঃ চঃ

রামানন্দ রায় বললেন—রাধা কৃষ্ণের বিলাসতত্ত্ব নিরন্তর প্রেম বিলাস। এই বিলাসের শুরু নেই শেষও নেই। যাকে বলা যায় নিরবচ্ছিন্ন প্রেমবিলাস। রাত্রি দিন কুঞ্জে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমবিলাস। এ বিলাস ভক্তের সঙ্গে ভগবানের।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—এ ছাড়াও কি আর কিছুই নেই?

রায় রামানন্দ বললেন—এর বাইরে আরো কিছু আছে। সে যে প্রেমবিলাসের গূঢ় রহস্য। এ প্রেমবিলাস তুমি কি অনুভব করতে পারো না? তোমার তো সবই জানা।

তবু আমার মুখ দিয়ে বলাতে চাও প্রভু। তবে তোমাকে আমার রচিত একটি গান শোনাই।

গাহ লহি রাগ নয়ন ভঙ্গভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুই মন মনোভাব পেশল জানি॥
এ সখি সো সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহবি কিছু বল জানি॥
না খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন।

দুহুকো মিলন মধ্যে ত পাঁচবান ॥
অব শোই বিরাগ তুহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি ॥

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তোমাকে দেখতে পেলাম কি পেলাম না—এর মধ্যেই অনুরাগ জন্মাল। সেই অনুরাগ বৃদ্ধি হতে চললো। জন্মের পূর্ব থেকেই এই অনুরাগ ছিল কি না জানি না। অনুরাগ বুকে নিয়েই জন্মলাভ করেছিলাম কি না কে জানে? নইলে চোখ মেলেই যেন কৃষ্ণ মুখ দেখি। কৃষ্ণ মুখ না দেখে চোখ খুলবো না এই সঙ্কল্প নিয়েই কি চোখ বন্ধ করে জন্মলাভ করেছিলাম কি না? আমি রমণী—সে রমণ। অর্থ—আমি স্ত্রী, সে স্বামী। এই সম্বন্ধ থেকেই তো অনুরাগ জন্মলাভ করে না। আমি—আর সে, তুমি আর আমির মধ্যে কোন ভেদ বুদ্ধি নেই, নেই কাণ্ডকাণ্ডার সীমারেখা। প্রেমের পেষণ—দুজনকে একজন করেছে। এক দেহে দুই প্রাণ, এক দেহে দুই মন। এই দুই মনের খেলা একই দেহে। কখনো বা কানাই, কখনো রাধা। কখনো ভগবান কখনো ভক্ত। ভগবান ও ভক্তে কৃষ্ণ ও রাধার সঙ্গে মিলন ঘটাতে দূতীর খোঁজ করতে হয় না। দুজনের মিলনের মধ্যে পঞ্চবাণের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। শুধু জন্মের আগে থেকেই পরস্পরের যে নিদরুণ বিরাগ, এই বিরাগই দূতীর রূপ ধারণ করে মিলনের সেতু গড়ে তুলেছে।

গদ্‌গদ্ কণ্ঠে রায় রামানন্দ বললেন—প্রভু, সাধ্য বস্তুর কথা এর চাইতে আর আমি জানি না। তোমার কৃপায় আমি এইটুকুই বলবার অধিকার পেয়েছি।

তুষ্ট হলেন গৌরাঙ্গদেব। রামানন্দের ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেন। মৃদু হেসে বললেন—তোমার প্রসাদে সাধ্য বস্তুর সীমানা জানলাম।

প্রভু কহে সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥

গৌরাঙ্গদেব বললেন—সাধ্য বস্তু সাধন বিনা কেউ পায় না। তুমি কৃপা করে বল—কোন সাধনায়—কি উপায়ে সাধ্যবস্তু পাওয়া যায়!

রামানন্দ বললেন—আমি কিছুই জানি না। কারণ, আমার মুখে তুমি বক্তা, তুমিই শ্রোতা। রাধাকৃষ্ণ লীলা অতি গূঢ় রহস্য। সেই গূঢ় তত্ত্ব আমার কাছে শুনতে

চেয়েছো। আমি কতটুকুই বা জানি যে তোমাকে বলবো! রাধাকৃষ্ণ লীলার রহস্যের গূঢ়তত্ত্ব দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ভাবেরও অগোচর। একমাত্র সখীগণেরই এই লীলা আস্বাদনের অধিকার। কারণ, সখীগণের ভেতর থেকেই এই লীলা বিস্তারিত হয়। সখীগণই এই লীলা পুষ্ট করেন। সখীগণই এই লীলা আস্বাদন করেন। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ লীলা রহস্য সখী বিনা আস্বাদন সম্ভব নয়। তাই এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে হলে সখীদের অনুগত হতে হবে। রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জের সেবার সাধনা করতে হবে। সখীগণের স্বভাব মুখে প্রকাশ করা যায় না।

আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটি গুণ॥
গোপীর দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটি গুণ গোপী আস্বাদয়॥
তা সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়িল সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণ সুখে পর্যবসান॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত॥
এই মত অন্য অন্যে পড়ে হুড়াহুড়ি।
অন্য অন্যে বাড়ে সুখ কেহ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ গুণে।
তার সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥ চৈঃ চঃ।

রায় রামানন্দ বললেন—রাধার স্বরূপ বলতে গেলে বলা যায়—কৃষ্ণ প্রেমের কল্প-

লতা। এই লতার পল্লব, পুষ্প, পাতা সবই গোপীগণ। এই লতায় কৃষ্ণ লীলামৃত সিঞ্চন করা হলে কল্পলতার পল্লব, পুষ্প, পাতার কান্তি সৌরভ বৃদ্ধি পায়। তাতে কল্পলতার নিজের সুখের চাইতে কোটিগুণ সুখ বৃদ্ধি পায়—পল্লব, পুষ্প পাতার। গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলায় হয়তো তেমন মন নেই। তবু শ্রীরাধিকাই সযত্নে সখীদের কৃষ্ণলীলায় সাহায্য করেন। নানা ছলে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীগণের মিলন হলে গোপীদের আত্মসুখসঙ্গের চাইতে কৃষ্ণসুখসঙ্গের বৃদ্ধি পায়। কারণ—

নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য।
কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য গোপীভাব বর্য্য॥ চৈঃ চঃ।

রাধাকৃষ্ণের লীলার গূঢ়তত্ত্ব গোপীভাবে ভজনা। এই ভজনের অধিকার জন্মে শৃঙ্গার রসোপাসনার ফলে। ভিতরে ও বাহিরের মিলনের ভূমিই গোপীভাব। সন্ধিনী শক্তির অর্থ অস্তিত্ব আর সংবিৎ বা চিৎ বা জ্ঞান শক্তির অর্থ জানা। অস্তিত্ব বা কে আছে···কি আছে, আর জ্ঞান বা কি জানা যাচ্ছে···কাকে জানা যাচ্ছে···সংসারে এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থাকলেই মিলন। গোপী ভাবই এই মিলনের ভূমি। শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্বকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসু রর্থার্থ জ্ঞানী চ ভারতর্ষভ॥

আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চার প্রকার ভক্ত রয়েছেন। তার মধ্যে— আর্ত শব্দের অর্থ যে পেয়েও হারিয়েছে অর্থাৎ নষ্ট বস্তু পুনঃপ্রাপ্তির কামনা রয়েছে যার, জিজ্ঞাসু অর্থ যে জানতে চায়, অর্থার্থী অর্থ যে অর্থ চায়। আর জ্ঞানী যিনি সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে চায়। এর মধ্যে আর্ত ও অর্থার্থী প্রায় একশ্রেণীর, এদের বাইরের বলা চলে। আর জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী এদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও শ্রেণীতে ঐক্য রয়েছে···তাই এরা ভেতরের বলা চলে। গোপী ভাব ভিতর ও বাহিরের স্তর অতিক্রম করে এক অভিনব সোপানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই চার শ্রেণীর ভক্ত আত্মসুখেচ্ছু, কম-বেশী আপনার দিকটাই দেখেন। তাঁরা কেউ বলেন না—হে আনন্দস্বরূপ, তুমি আনন্দিত হও···আমি তাতেই আনন্দিত। গোপীগণ সেই কথাই বলেন। গোপীগণ দেখেন—বৃন্দাবনে দ্বিতীয় কোন পুরুষ

নেই। গোপীগণের দৃষ্টিতে—সুবল, সুদাম, সবাই কৃষ্ণের সেবক। বৃন্দাবনের মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তরুলতা নদী পর্বত অরণ্য স্থাবর জঙ্গম সবাই একজনের সুখের জন্য উন্মুখ। একজনকে কেন্দ্র করেই সবাই তাঁর সুখ আস্বাদনে উন্মুখ। গোপীগণ বলেন—কৃষ্ণ, তুমি আনন্দিত হও, আমার যা কিছু আছে সব গ্রহণ করো, আমার সব কিছু গ্রহণ করে সুখী হও। আমার মধ্যে একাত্ম হয়ে উল্লসিত হও। আমার বলতে তো কিছুই নেই, তোমাকে নিয়েই তো আমি। তাই আমার যা কিছু আছে গ্রহণ করো। হে রসস্বরূপ কৃষ্ণ, তোমার যে রসে আমি রসিকা, সেই রস তুমি ভিন্ন আর কে গ্রহণ করবে? তোমাকে পাওয়ার ভেতরেই তো আমি সার্থক।

গোপীপ্রেম করে কৃষ্ণ মাধুর্যের পুষ্টি।
মাধুর্যে বাড়য়ে প্রেমে হয় মহাতুষ্টি॥
প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥

তাই গোপীপ্রেম সম্পর্কে বলা যায়—

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী প্রেম।
নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥
কৃষ্ণের সহায়, গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা, সখী, দাসী॥

রাধাকৃষ্ণ লীলার গূঢ় রহস্য গোপী ভাব গ্রহণ কয়ে রাত্রি দিন অহর্নিশি রাধাকৃষ্ণ নাম মনন ও চিন্তন।

সিদ্ধিদেহে চিন্তি করে তাহাঙ্ঘ্রি সেবন।
সখী ভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

রাধাকৃষ্ণ লীলা রহস্য শ্রবণ করে গৌরাঙ্গদেব আলিঙ্গন করলেন রামানন্দকে।

দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করে ক্রন্দন করলেন। সারারাত্রি অতিবাহিত করলেন প্রেমাবেশে। বিদায় নেবার সময় রামানন্দ গৌরাঙ্গদেবের চরণ বন্দনা করে বললেন —তুমি কৃপা করে আমার জন্যই এসেছো। দশদিন অবস্থান করে তুমি আমার দুষ্ট মনকে শোধিত করেছ। তুমিই জীব উদ্ধার করতে পারো। তুমি ছাড়া আর কে কৃষ্ণ প্রেম দান করতে পারবে!

গৌরাঙ্গদেব বললেন—তুমি কি বলছো? তোমার কথা শুনেই তো এখানে এসেছি। তুমি কৃষ্ণকথা শুনিয়ে আমার মন শুদ্ধ করেছ। তোমার কাছ থেকেই কৃষ্ণ মহিমা শুনলাম। রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জ্ঞানের সীমা নেই, সেই জ্ঞান তুমি আমাকে দিয়েছো। দশদিন তোমার সঙ্গে অবস্থান করে যা আমি পেয়েছি, সারা জীবনে আমার মনে থাকবে। তোমার সঙ্গ আমি কখনই ছাড়বো না। নীলাচলে— তুমি আমি একসঙ্গে থাকবো। দিনরাত দুজনে কৃষ্ণকথা শুনবো, কৃষ্ণ আলাপনা করবো।

প্রত্যুষে রামানন্দ বিদায় নিলেন। আবার সন্ধ্যায় এলেন গৌরাঙ্গদেবের কাছে। দুজনে নিভৃতে বসে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করলেন। কথা প্রসঙ্গে গৌরাঙ্গদেব বললেন— আচ্ছা, কোন্ বিদ্যা—বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ?

রায় বললেন—কৃষ্ণ ভক্তিই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—কীর্তিগণের মধ্যে জীবগণের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি?

—কৃষ্ণভক্ত বলে যে খ্যাতি, সেই খ্যাতিই শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

—সম্পত্তির মধ্যে জীবগণের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি কি?

রায় বললেন—রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী।

—দুঃখের মধ্যে কোন্ দুঃখ গুরুতর?

—কৃষ্ণ ভক্তি বিরহই গুরুতর দুঃখ।

—মুক্ত মধ্যে কোন্ জনকে মুক্ত মনে করা হবে?

—কৃষ্ণ প্রেমীই মুক্ত শিরোমণি।

—গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম?

রায় রামানন্দ বললেন—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা যে সঙ্গীতে আছে, তাই জীবের শ্রেষ্ঠ গান।

—শ্রেয় মধ্যে জীবের শ্রেষ্ঠ সার কি?

—কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গই শ্রেয়।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—কাহার স্মরণ, জীবগণ অনুক্ষণ করবে?

রায় বললেন—কৃষ্ণ নাম গুণ লীলা।

—ধ্যেয়ের মধ্যে জীবের কোন্ ধ্যান শ্রেষ্ঠ ?

—রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—সব কিছু ত্যাগ করে জীবের কোথায় বাস করা কর্তব্য ?

রায় রামানন্দ বললেন—শ্রীবৃন্দাবন ধামে।

—শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?

—রাধাকৃষ্ণ প্রেম লীলা।

—উপাস্যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান ?

—যুগল রাধাকৃষ্ণ।

মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে সেই কাঁহা দুঁহার গতি।
স্থাবর দেহ দেব দেহ যৈছে অবস্থিতি॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥

মুক্তি আর ভক্তি এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ গতি বাঞ্ছা করা শ্রেয়। স্থাবর দেহ আর দেব দেহ যেমন অবস্থিতি ঠিক তেমনি। মুক্তি বাঞ্ছা করে যে সাধনা করে সে অরসজ্ঞ স্থাবর দেহী। সেই অরসজ্ঞ কাক, জ্ঞানরূপ তিক্ত নিম্বফল চুষে খায়। আর দেবদেহী রসজ্ঞ কোকিল, সে প্রেম রূপ আম্র মুকুলের মধুরস পান করে।

অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥

এই ভাবেই গৌরাঙ্গদেব আর রায় রামানন্দ সারারাত কৃষ্ণলীলামৃত পান করে আবার প্রত্যুষে রায় বিদায় নিলেন। সন্ধ্যায় আবার এলেন রামানন্দ। গৌরাঙ্গদেবের চরণ বন্দনা করে বললেন—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, সব তত্ত্বই তোমার প্রসাদে আমার মুখ দিয়ে প্রকাশিত হল। ব্রহ্মাকে যেমন নারায়ণ বেদ পাঠ করান ঠিক তেমনি। অন্তর্যামী ঈশ্বরের রীতিই এই। বস্তু বাহিরে প্রকাশ করে না—হৃদয়ে প্রকাশ করে।

গৌরাঙ্গদেব হাসলেন রামানন্দের কথা শুনে।

রামানন্দ বললেন—আমার মনে এক অদ্ভুত সংশয়। কৃপা করে তুমি যদি এই সংশয় দূর করো!

গৌরাঙ্গদেব বললেন—বেশ তো বল!

—প্রথম যেদিন তোমার দর্শন পেলাম, সেদিন তোমাকে দেখেছিলাম তরুণ সন্ন্যাসী। এখন দেখি তোমাকে শ্যাম গোপরূপ। তোমার এই অঙ্গকান্তি যেন গৌর-বর্ণের আবরণে ঢাকা। তার ওপরে তোমাকে দেখি বংশীধর। তোমার কমল নয়ন যুগল ভাবে চঞ্চল।

এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপট কহ প্রভু কারণ ইহার॥ চৈঃ চঃ।

গৌরাঙ্গদেব হেসে বললেন—কৃষ্ণে তোমার প্রেম গাঢ়। প্রেমের স্বভাব তুমি নিশ্চয়ই জানো। যিনি মহাভাগবত, তিনি স্থাবর জঙ্গম যা কিছুই দেখেন না কেন, সব কিছুর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরণ দেখতে পান। তখন আর স্থাবর জঙ্গম দেখতে পান না, সর্বত্রই ইষ্টদেব দর্শন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা আছে।—

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষু ভাগোবতোত্তমঃ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম আছে, তাই সর্বত্র তুমি রাধাকৃষ্ণের অস্তিত্ব দেখতে পাও।

রামানন্দ বললেন—প্রভু, তোমার সমস্ত চাতুরী বুঝতে পেরেছি। তুমি আমার চোখের সামনে নিজের রূপ চুরি করে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। আমি বুঝতে পেরেছি। শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করেছিলে তুমি। তাই নিজ রস আস্বাদন করবার জন্য অবতার হয়ে এসেছো। নিজ গূঢ় কার্য, তোমার প্রেম আস্বাদন আর সেই সঙ্গে সমস্ত ত্রিভুবনকে প্রেমময় করতে এসেছো মর্ত্যলোকে। আমি ভাগ্যবান, তাই তুমি এসেছো কৃপা করে আমাকে উদ্ধার করতে।

শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥

নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥

অবাক হয়ে দেখলেন রায় রামানন্দ গৌরাঙ্গদেবকে। কেমন যেন হয়ে গেলেন রামানন্দ। এ কি অদ্ভুত রূপ! যে রূপের আভাষ, যে ভাবকান্তির অস্পষ্ট ছবি ভেসে উঠেছিল, সেই ভাবকান্তিই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বরূপ—রস-রাজ কৃষ্ণ আর মহাভাব স্বরূপিণী রাধিকা, এই দুই রূপ যেন এক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চোখের সামনে। প্রেমাবেশে মূর্ছিত হলেন রায় রামানন্দ।

দশ দিন দশ রাত্রি অতিবাহিত হল। বৈষ্ণব রসে রসিক রায় রামানন্দ গৌরাঙ্গ-প্রেমে আকুল হয়ে রইলেন। বিদায়ের সময় এসে গেল। গৌরাঙ্গদেব বললেন—আমি অল্পকাল তীর্থ সমাপন করে নীলাচলে আসবো। তুমি আমি দুজনে নীলাচলে থেকে কৃষ্ণকথা রঙ্গে সুখে কাল কাটাবো।

বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তঁথা আসিব অল্পকালে॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণ কথারঙ্গে॥ চৈঃ চঃ।

বিদ্যানগর ত্যাগের পূর্বে গৌরাঙ্গদেব অবগাহন সম্পন্ন করলেন পবিত্র গৌতমী গঙ্গায়। গঙ্গাতীরেই কোটিলিঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির। শিবদর্শন করলেন তিনি। তারপুর অপেক্ষমাণ রায় রামানন্দের কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন। রায় রামানন্দের সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন সহস্র বৈদিক ব্রাহ্মণ। গৌরাঙ্গদেবের প্রভাবে তাঁরা সবাই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তাঁরা অহর্নিশি কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন করেন।

বিদ্যানগর থেকে এসেছেন নানা ধরনের মানুষ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ, অনেকেই শৈব। কেউ কেউ মায়াবাদী তার্কিক পণ্ডিত। নামমাহাত্ম্যের গুণে সবাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভক্তিবাদের কাছে পরাভূত হয়ে তাঁরা গৌরাঙ্গদেবের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছিলেন। সমস্ত বিদ্যানগরই অবশেষে বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হয়েছিল। আশা পূর্ণ হয়েছে গৌরাঙ্গদেবের। সুদূর নবদ্বীপ থেকে পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছিলেন নীলাচলে জগন্নাথ তীর্থে। সার্বভৌম পণ্ডিতকে ভক্তিবাদে বিশ্বাসী করবার পর এসেছেন দক্ষিণদেশে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রায় রামানন্দ তাঁর

আশ্রিত। স্বভাবতঃই তাঁর অদ্ভুত ভাবান্তর সর্বসাধারণের মনে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। অশোকের সময়কাল থেকেই বিদ্যানগর ছিল বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান। পরবর্তীকালে—খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন আদি শঙ্করাচার্য বৌদ্ধমতবাদ খণ্ডন করে। সেই সময় থেকেই সমস্ত অঞ্চল শৈবক্ষেত্র বলে পরিচিত হয়েছিল। বিদ্যানগরের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে বিখ্যাত গৌতমীগঙ্গার তীরেই অবস্থিত কোটিলিঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির। অন্যান্য শিবমন্দিরগুলির মধ্যে সোমেশ্বর শিব ও ভীমেশ্বর শিব মন্দির-গুলি প্রধান।

রায় রামানন্দ ব্যাকুল হলেন গৌরাঙ্গদেবের অনুপস্থিতির কথা ভাবতেই। দাক্ষিণাত্যের তীর্থদর্শন সমাপ্ত করে আবার বিদ্যানগরেই ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গৌরাঙ্গদেব রায় রামানন্দকে আলিঙ্গন করলেন। অশ্রুসজল চোখ দুজনের। প্রেমে কণ্ঠ প্রায় অবরুদ্ধ। গৌরাঙ্গদেবকে যতদূর দেখা যায় ততদূর দেখলেন রায় রামানন্দ। অদৃশ্য হতেই কেঁদে আকুল হলেন তিনি। গৌরাঙ্গদেবের বুকের মাঝখানে যেন অদ্ভুত বেদনা। ব্যাকুলকণ্ঠে একই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে চললেন—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্॥

গোদাবরীর বিশাল উপত্যকার সমতল ভূমির ওপর দিয়ে রাজপথ। এগিয়ে চললেন সেই রাজপথ অনুসরণ করে। পথে কোথায়ও বনভূমি, দূরে দূরে গ্রাম। আর গ্রামে গ্রামে দেবালয়। দেবালয়ে আশ্রয় নিলেন রাত্রিবাসের জন্য দিনান্তের পদযাত্রা সমাপ্ত করে। পথ চলতে চলতে কীর্তন। এমনি করে এগিয়ে চললেন। এক সময়ে সমতল ভূমি পেরিয়ে পৌঁছে গেলেন বন্ধুর পার্বত্যভূমিতে। পথ চলতে চলতে কৃষ্ণানদীর তীরে এসে পৌঁছে গেলেন। নীলাভ জলধারা—জলের বর্ণ দেখে যেন ব্যাকুল হলেন। এই পার্বত্য পথ বেয়েই চড়াই ভেঙে এগিয়ে গেলেন। বিপজ্জনক পথ, শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর বনভূমির ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হল দীর্ঘ পথ। এই পথেই অবস্থান করে দস্যুদল, তীর্থযাত্রী আর পদযাত্রীদের হত্যা করে ধনরত্ন কেড়ে নেয়। সেই সব গভীর অরণ্য ও পার্বত্যভূমির ভেতর দিয়ে চললেন কৃষ্ণগুণগান করতে করতে। ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলেন সুন্দর উপত্যকায়। নাম শ্রীশৈলম। এই

শ্রীশৈলমের প্রশস্ত জনপদের মধ্যেই অবস্থিত বিখ্যাত শিব মন্দির মল্লিকার্জুন। এই শ্রীশৈলমের পাদদেশে খাড়া গিরিখাত বেয়ে প্রবাহিত কৃষ্ণা নদীর নীলাভ জলধারা। তটভূমির কাছেই অবস্থিত পাতাল গঙ্গা। মল্লিকার্জুন শিব দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম। গুন্টুর জেলার নালীমালাই উপত্যকায় সমুদ্রতল থেকে ১৭৫০ ফুট উচ্চতায় মল্লিকার্জুন তীর্থ। মূল মন্দিরের চার পাশে প্রস্তরময় প্রাচীর। প্রাচীর-গাত্রে রামায়ণ-মহাভারতের চিত্র পাথরে খোদাই করা রয়েছে। শিব দর্শন করলেন। শিবগুণগান করতে করতে প্রেমাবিষ্ট হলেন তিনি। পূজারী ব্রাহ্মণ প্রসাদ বিতরণ করলেন।

এই দুর্গম তীর্থে কয়েক দিন অবস্থান করলেন গৌরাঙ্গদেব। চার দিকের সুন্দর পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করলো। যথার্থই এ দেবস্থান। মন্দির দর্শন আর কীর্তনানন্দে সমস্ত সময় অতিবাহিত হল। বহু দূর দূরান্ত থেকে আসা তীর্থযাত্রীরা তাঁর প্রেমভক্তি লক্ষ্য করে মুগ্ধ হল। তারাও অভিভূত হয়ে গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে কীর্তনে যোগদান করলো।

মল্লিকার্জুন তীর্থের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব খর্ব হতেই আদি শঙ্করাচার্যের প্রভাবে স্থানটির অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। তাই সমস্ত অঞ্চল জুড়েই শিব মন্দির। পাহাড় পরিবেষ্টিত মল্লিকার্জুন তীর্থ থেকে বিদায় নিয়ে আবার শ্বাপদ-সঙ্কুল বনভূমির ভিতর দিয়ে চললেন পদ-যাত্রায়।

দুর্গম পথ অতিক্রম করে গৌরাঙ্গদেব পৌঁছে গেলেন নালীমালাই পর্বত শিখরে। সেখানে অবস্থিত মহানন্দী শিব মন্দির। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রামদাস শিব। মহা-নন্দী শিব মন্দির অনেকটা বৌদ্ধ গুম্ফার মতোই। মন্দিরের সন্নিকটে বয়ে চলেছে ছোট ঝরণাধারা। এই ঝরণাধারার জল সঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি করেছে সুন্দর সরোবর। সরোবরের জলকে তীর্থ যাত্রীরা পরম পবিত্র বলে মনে করেন। রামদাস শিব দর্শন করে বিদায় নিলেন শিব শম্ভুর কাছ থেকে। পার্বত্য পথ বেয়ে অবতরণ করলেন। দীর্ঘ উৎরাই পথ বেয়ে পর্বতমালার পাদদেশে পৌঁছে গেলেন অহোবিলে। অহোবিলে নৃসিংহদেবের মন্দির। সমস্ত ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই নৃসিংহদেবের মন্দির রয়েছে। সীমাচলমের মন্দির বিখ্যাত। সেই সীমাচলম্ বা সিংহাচলম্-এ অনেকের ধারণা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু রাজধানী স্থাপন করেছিল সুদূর অতীতযুগে।

সীমাচলমের নৃসিংহদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ভক্ত প্রহ্লাদ। ঠিক এমনি প্রচলিত প্রবাদ, অহোবিল…দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর রাজধানী। কাছেই

ভবনাশিনী নামে ছোট নদী প্রবাহিত। পাহাড়ের ঢালের মুখেই অহোবিল মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। মন্দিরের সামনেই সুন্দর স্তম্ভ। তীর্থযাত্রীদের ধারণা—এই স্তম্ভ দেখিয়ে ভক্ত প্রহ্লাদকে বলেছিলেন ক্রুদ্ধ দৈত্যরাজ…তোর ভগবান বিষ্ণু কি এই স্তম্ভের ভেতরেও থাকেন! ভক্ত প্রহ্লাদ বিনীত কণ্ঠে করজোড়ে বলেছিলেন—হ্যাঁ পিতা, ভগবান বিষ্ণু সর্বত্রই অবস্থান করেন। এমনি এই স্তম্ভের মধ্যেও।

তবে দেখি, তোর ভগবান এই স্তম্ভে আছেন কি না? এই বলে স্তম্ভে পদাঘাত করেছিলেন দৈত্যরাজ। দৈত্যরাজের পদাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গর্জন করে নৃসিংহরূপী ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত হলেন। তাঁর ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর মূর্তি, প্রচণ্ড গর্জনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন দৈত্যরাজ। তারপর প্রচণ্ড গর্জনে নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করে শান্ত স্মিত কণ্ঠে বর দান করলেন প্রহ্লাদকে।

দূরদূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রী আসেন অহোবিলে নৃসিংহদেব দর্শন করবার জন্য। কুন্দল জেলার অন্তর্গত সীবলি তালুকে এই অহোবিল জনপদ। গৌরাঙ্গদেব নৃসিংহ-দেবকে স্তবস্তুতি করলেন। ভগবান বিষ্ণুর বন্দনা গান গাইলেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে। তারপর আবার যাত্রা শুরু করলেন। ছোট ছোট গ্রাম আর জনপদ অতিক্রম করে তিনি পৌঁছে গেলেন সিদ্ধবটে। সে যুগে সিদ্ধবট ছিল বৌদ্ধ তীর্থস্থান। সেখানে রয়েছে পবিত্র বটবৃক্ষ। সেই বটবৃক্ষের অঙ্গনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অবস্থান করতেন, সাধন-ভজন করতেন। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে বৌদ্ধ সঙ্গীতের স্বর ভেসে বেড়াতো। কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস হতে থাকে।

ঠিক তেমনি সময় আদি শঙ্করাচার্যের প্রভাবে—বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব খর্ব হয়, শৈবধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় শিব মন্দির। কিন্তু এই শিব স্থানের মাঝখানে সিদ্ধবটের প্রধান মন্দির ভগবান রামচন্দ্রের। রঘুনাথ দর্শন করে গৌরাঙ্গদেব অভিভূত হলেন। সীতাপতি রামচন্দ্রের মূর্তি দর্শন করে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। কীর্তন করলেন মহানন্দে—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।

গৌরাঙ্গদেবের ভাবমূর্তি দর্শনে মুগ্ধ হলেন রামচন্দ্রের উপাসক একজন ব্রাহ্মণ। তাঁর অনুরোধে গৌরাঙ্গদেব আতিথ্য গ্রহণ করলেন। রামভক্ত ব্রাহ্মণ, গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে সারাদিন রাত্রি অতিবাহিত করে মুগ্ধ হলেন। অভিভূত হয়ে কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা হলেন। সিদ্ধবটের অধিবাসীরা এলেন দলে দলে, তরুণ সন্ন্যাসী দর্শনের আশায়।

তারাও মুগ্ধ হল। গৌরাঙ্গদেবের প্রভাবে ভক্তিবাদ প্রচারিত হল। কুতুপ্পার কাছেই অবস্থিত সিদ্ধবট। সিদ্ধবট থেকে বিদায় নিলেন গৌরাঙ্গদেব। প্রত্যুষে পদাযাত্রা শুরু করে পৌছে গেলেন ত্রিমল্লে…সেখানে বিষ্ণু দর্শন করে পৌছে গেলেন স্কন্দ ক্ষেত্রে। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত কার্তিকেয় মন্দির। স্কন্দক্ষেত্রের বর্তমান নাম তিরুত্থানী। তিরুত্থানী চিত্তুর জেলায় অবস্থিত। কার্তিকেয় দেব দর্শন করে গৌরাঙ্গদেব আবার ফিরে গেলেন সিদ্ধবটে। সেখানে আতিথ্য নিলেন ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে। সেখানে রাত্রিবাস করে প্রভাতে যাত্রা শুরু করলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি পৌছে গেলেন বৃদ্ধকাশীতে। বৃদ্ধকাশীর বর্তমান নাম পুতুবেলী গোপুরম। সেখানে বিখ্যাত শিবমন্দির রয়েছে। শিবমন্দিরে…শিব দর্শন করলেন, শিব বন্দনা করলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা তেজোদৃপ্ত তরুণ সন্ন্যাসী দর্শন করে মুগ্ধ হল। সেখানকার ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলো। বৃদ্ধকাশী…পবিত্র শিবস্থান। সারাদিন অতিবাহিত হল কীর্তনে আর কৃষ্ণগানে। তাঁর ভাবাবেশ, কীর্তনে সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করে অসংখ্য মানুষ মুগ্ধ হল। অসংখ্য লোক এলো দর্শন করবার জন্য। গৌরাঙ্গদেবের প্রভাবে সবাই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হল। বহু শৈব বৈষ্ণব হল, বহু বৌদ্ধধর্মী নরনারী গৌরাঙ্গদেবের ভক্তিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। বৃদ্ধকাশীর বৌদ্ধ আচার্য গৌরাঙ্গদেবকে অসম্মান করবার চেষ্টা করেও সফল হতে পারলো না। গৌরাঙ্গদেবের চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হল…ভক্তিবাদের কাছে পরাভূত হল।

এই মতে বৈষ্ণব করিল দক্ষিণ দেশ ॥

বৃদ্ধকাশী থেকে বিদায় নিলেন গৌরাঙ্গদেব…অসংখ্য ভক্তগণ সাশ্রুনয়নে বিদায় দিলেন। আবার পদযাত্রা শুরু হল। যেন অবিরাম পদযাত্রা…পথ চলায় ক্লান্তি নেই…দুর্গম পথ, গভীর অরণ্য, পার্বত্য অঞ্চল…গৌরাঙ্গদেবের কাছেই সবই যেন সমান। রাত্রিবাসের আশ্রয় সর্বত্র, প্রতিদিন ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন দিনান্তে…। সন্ন্যাসী…প্রয়োজন বোধ নেই। পথ চলা আর না চলা দুই-ই সমান। কীর্তনানন্দে ভাবে বিভোর তাই পথ চলার ক্লান্তি বোধ হয় না। এমনি করেই পৌছে গেলেন ত্রিপদী ত্রিমল্লে।

পূর্বঘাট পর্বতমালার একটি গিরিশিরার ওপরে অবস্থিত সাতটি পর্বত শিখর। পর্বতশিখরগুলি পবিত্র। শিখরগুলোর পরিচয়—শেষাচলম্, বেদাচলম্, গরুড়া-

চলম্, অঞ্চলাচলম্, বৃষাচলম্, নারায়ণাচলম্ ও বেঙ্কটাচলম্। এই বেঙ্কটাচলমের নামই ত্রিমল্ল বা তিরুমালাই। পর্বতটির পাদদেশের জনপদের নাম ত্রিপদী। বেঙ্কটাচলমের পাদদেশে ছড়িয়ে রয়েছে গ্রাম। পর্বতের শিখরদেশে প্রশস্ত উপত্যকা। সেই উপত্যকায় অবস্থিত তিরুপতির মন্দির। মন্দিরে রয়েছে বেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি। সমুদ্রতল থেকে তিরুপতির উচ্চতা প্রায় ৩০০০ ফুট। মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার সাধন করতেন সে যুগের চোল রাজা আর পল্লব রাজারা। বিজয়নগরের রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ছিল পবিত্র দেবস্থানের। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে তীর্থযাত্রী আসতেন তিরুপতি মন্দিরে। সে যুগে যানবাহন ছিল না।

তীর্থ দর্শনের জন্য পদযাত্রাই ছিল একমাত্র উপায়। দীর্ঘ পার্বত্য পথ, কঠোর পরিশ্রম করে পার্বত্য চড়াই পথ পেরিয়ে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে তীর্থযাত্রীরা পৌঁছে যেতেন তিরুপতি মন্দিরে। গৌরাঙ্গদেবও পৌঁছে গেলেন তিরুপতিতে। মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর বিলাস মূর্তি। প্রেমে বিহ্বল হলেন গৌরাঙ্গদেব। ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ ভগবান···সেই ঐশ্বর্যের বহিঃপ্রকাশের সামান্যটুকুই সবাই দর্শন করে মুগ্ধ হয়। ভগবান বিষ্ণুর বিলাসব্যসন···ভাবাবেগে আকুল হলেন তিনি। তিরুপতিতে অবস্থান করলেন গৌরাঙ্গদেব। মন্দির দর্শন, আরতি দর্শন করলেন। পূজারী ব্রাহ্মণ ভগবানের প্রসাদ দান করলেন। সারাদিন কীর্তন, দিনান্তে ভগবানের প্রসাদ ভক্ষণ। তিরুপতি থেকে বিদায় নিয়ে অবতরণ করলেন। পথে ত্রিপদিতে রঘুনাথ দর্শন করলেন রঘুনাথ মন্দিরে। সেখান থেকে প্রায় দুশো মাইল পথ অতিক্রম করে পৌঁছে গেলেন পানা নৃসিংহে। বেজোয়াদা থেকে মাত্র সাত মাইল দক্ষিণে মঙ্গলগিরিতে অবস্থিত নৃসিংহ দেবতার মন্দির।

নৃসিংহদেব দর্শন করে স্তব স্তুতি করলেন গৌরাঙ্গদেব। আবার পদযাত্রা শুরু করলেন দক্ষিণ দিকে শিবকাঞ্চী আর বিষ্ণুকাঞ্চীর উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ পথ প্রায় দুশো আশী মাইল অতিক্রম করতে হল গৌরাঙ্গদেবকে। প্রশস্ত সমতল ভূমির বুকের ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে রাজপথ। পথে পথে গ্রাম, জনপদ, দেবালয়। দেবালয়ে রাত্রিবাস করতেন···সারাদিন পথ চলা···আর নামসংকীর্তন। কীর্তন করতে করতেই দীর্ঘ পথ সংক্ষিপ্ত হল। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ কাঞ্চীপুরমে পৌঁছে গেলেন তিনি। কাঞ্চীপুরম···সুদূর প্রাচীন যুগ থেকেই পবিত্র তীর্থভূমি নামে পরিচিত। স্কন্দ পুরাণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে সাতটি পবিত্র তীর্থপুরীর উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে অযোধ্যাপুরী, মথুরাপুরী, মায়াপুরী, কাশীপুরী, কাঞ্চীপুরী ও অবন্তিকাপুরী। এই সাতটি পুরীর মধ্যে শিবতীর্থ তিনটি, বিষ্ণুতীর্থ তিনটি।

আর একমাত্র কাঞ্চীপুরমে রয়েছে পাশাপাশি শিবতীর্থ ও বিষ্ণুতীর্থ। শিব-কাঞ্চীতে বিখ্যাত শিবমন্দির আর তার পাশেই বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণুমন্দির। এই সব মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন চোল রাজা, পহ্লব রাজা আর বিজয়নগরের রাজা। তবে মন্দির গাত্রে পহ্লব স্থাপত্যের চিহ্ন রয়েছে। কাঞ্চীপুরমে কৈলাসনাথের মন্দির দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম মন্দির। গৌরাঙ্গদেব প্রাচীন পবিত্র তীর্থস্থানে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম শিবতীর্থ শিবকাঞ্চীতে শিব দর্শন করলেন। শিববন্দনা করে আনন্দে নৃত্য করলেন।

শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিবদরশন।
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ॥

শিবকাঞ্চী দর্শন করবার পর গৌরাঙ্গদেব প্রবেশ করলেন বিষ্ণুকাঞ্চীতে। সেখানে বিষ্ণু মন্দিরে বিষ্ণুর দর্শন লাভ করলেন। প্রেমে আবিষ্ট হয়ে আনন্দে আত্ম-হারা হলেন। মন্দির বেষ্টন করে কীর্তন করলেন।

বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখে লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন॥

কাঞ্চীপুরম মন্দিরময় নগর। নগরের চারদিকে একশো আটাশিটি শিব মন্দির রয়েছে। সতেরোটি রয়েছে বিষ্ণুমন্দির। শিবমন্দির এতগুলো থাকলেও একটি মাত্র রয়েছে শক্তিমন্দির।

কাঞ্চীপুরমে অবস্থান করলেন গৌরাঙ্গদেব। তাঁর কীর্তনে অপরূপ ভাবাবেশে মুগ্ধ হল নগরের সমস্ত জনসাধারণ। ক্রমে সবাই কৃষ্ণ গানে মাতোয়ারা হল। শেষে কাঞ্চীপুরম থেকে বিদায় নিলেন গৌরাঙ্গদেব। কাঞ্চীপুরম থেকে গেলেন তিরুমালাই-এর কাছে। সেখানে বাইশ মাইল পথ পেরিয়ে শিব দর্শন করলেন ত্রিকাল হস্তিতে। ত্রিকাল হস্তির মন্দির নির্মাণ করেছিলেন পহ্লব রাজারা। মন্দিরের গোপুরম নির্মিত হয়েছিল একাদশ শতাব্দীতে চোল রাজাদের তত্ত্বাবধানে। ত্রিকাল হস্তি অতিক্রম করে গৌরাঙ্গদেব পৌঁছে গেলেন পক্ষীতীর্থে। ধীরে ধীরে পথ এগিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে। গভীর নারকেলকুঞ্জ···তার মাঝখান দিয়ে পথ। ঝাউগাছের গভীর বন অতিক্রম করে সমুদ্রতীরে বৃদ্ধকোলে পৌঁছে গেলেন। বৃদ্ধকোলের

বর্তমান নাম মহাবলীপুরম। সাতটি রথ-মন্দিরময় শহর মহাবলীপুরম। পাহাড়ের প্রস্তরগাত্র কেটে কেটে নির্মিত হয়েছিল মন্দিরগুলি। সপ্তম শতাব্দীতে পহ্লব রাজারা নির্মাণ করিয়েছিলেন মন্দিরগুলি। সুদূর অতীতে মহাবলীপুরম বন্দর নগর ছিল, এই স্থানের সাতটি মন্দিরের দুটি সমুদ্র গ্রাস করেছে। পাণ্ডবদের নামে মন্দির। অর্জুনের রথ, ভীমের রথ, ধর্মরাজের রথ, দ্রৌপদীর রথ…শ্রীকৃষ্ণের রথ। বিশাল প্রস্তরময় পাহাড়ের গা থেকে কেটে কেটে রূপ দেওয়া হয়েছে—অর্জুনের তপস্যা, গঙ্গার মর্ত্যে আগমন—এ ছাড়াও রয়েছে বিষ্ণুর বরাহ মূর্তি, বামন মূর্তি, গোবর্ধন গিরি, মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি। গৌরাঙ্গদেব বরাহ মূর্তি দর্শন করলেন। ঘুরে ঘুরে সমস্ত মন্দির দর্শন করলেন শেষে বৃদ্ধকোলে শ্বেতবরাহকে প্রণাম জানিয়ে গৌরাঙ্গ-দেব দীর্ঘ পথ পেরিয়ে পৌঁছে গেলেন পীতাম্বর শিবদর্শনের আশায়। স্থানটি সম্ভবতঃ চিদাম্বরমে—আকাশলিঙ্গ শিব। চিদাম্বরমকে অনেকে বলেন ভূলোক কৈলাশম্। কাবেরী নদীর সন্নিকটে ছোটখাটো নগর। নগরের কেন্দ্রস্থলে মন্দির। বিশাল নটরাজের মন্দির। কথিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর ভক্তদের সামনে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করে নৃত্য করেছিলেন। নটরাজ মন্দিরে নৃত্যের ভঙ্গিমায় শিব। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবকে মহাব্যোমরূপে কল্পনা করে আরাধনা করা হয় বলেই সম্ভবতঃ এই মূর্তিকে আকাশলিঙ্গ শিব বলা হয়। পীতাম্বর শিবকে প্রণাম করে গৌরাঙ্গদেব শৃগালী ভৈরবী পৌঁছে গেলেন। শৃগালী একটি ছোট গ্রামের নাম। এই গ্রামের জাগ্রতা মাতৃরূপিণী দেবী ভৈরবী প্রতিষ্ঠিতা। কাছেই সুন্দর সরোবর। সেই সরোবরে স্নান সম্পন্ন করে ভৈরবী দেবীকে পূজো দিলেন। সেখান থেকে গৌরাঙ্গদেব এগিয়ে গেলেন গো-সমাজ শিব দর্শন করবার জন্য। কাছেই বেদাবন। সম্ভবতঃ সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে গভীর বনভূমির নাম বেদারণ্য। এই বেদারণ্য পৌরাণিক যুগ থেকে শিবতীর্থ নামে পরিচিত ছিল। অরণ্যের মাঝখানে অবস্থিত প্রাচীন শিবমন্দির। মন্দিরের দেবতা…শিবকে বন্দনা করে গৌরাঙ্গদেব আরো দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি পৌঁছে গেলেন অমৃতলিঙ্গ শিবস্থানে। অমৃতলিঙ্গ মন্দির প্রাচীন গদাইকোণ্ডা চোল-পুরমে অবস্থিত। সে যুগে চোলরাজা এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। সে নগরী অবলুপ্তির পথে…কিন্তু অমৃতলিঙ্গ মন্দির দ্বিতীয় বৃহদেশ্বর মন্দিরের স্থান দখল করেছিল। অনেকে বলেন—অমৃতলিঙ্গ শিবস্থান সম্ভবতঃ কুদবাসল। কুম্ভকোনমে স্নান করবার পূর্বে কুদবাসলে স্নান করবার নির্দেশ ছিল। কথিত আছে —গরুড় অমৃতভাণ্ড নিয়ে যাবার সময় অর্ধেক অমৃত কুদবাসলে, বাকি অর্ধেকটুকু

কুম্ভকোনমে ফেলে দিয়েছিল। এমনি পবিত্র স্থান কুদবাসল। সেখানে স্নান সমাপন করে গৌরাঙ্গদেব অমৃতলিঙ্গ শিব দর্শন করেছিলেন। গরুড় অমৃতভাণ্ড ফেলে দেবার পর দেবস্থানে গিয়ে বিষ্ণু দর্শন করেছিলেন। দেবস্থানের নাম সম্ভবতঃ কুম্ভকোনমের ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত মন্নারগুড়ি। সেই স্থানে রাজগোপাল মন্দির বিখ্যাত। সম্ভবতঃ ১০৭০-১১১৮ সনে রাজা কুলোতুঙ্গ এই মন্দির নির্মাণ করান। মন্নারগুড়ির চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মহাদেব পত্তম বা দেবস্থান। তারপর কুম্ভকর্ণের কপালের সরোবর দেখে শিবক্ষেত্রে এসে শিব দর্শন করেছিলেন। এই শিবমন্দিরের নাম কুম্ভেশ্বর। সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলেন পাপনাশনে বিষ্ণু দর্শনের জন্য। বিষ্ণু দর্শন করে সেখানে বিষ্ণুর স্তব স্তুতি করলেন। পাপনাশনের পর বিখ্যাত শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্র। কাবেরী নদীর তীরদেশে অবস্থিত বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দির রঙ্গনাথ।

* * *

শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রে তবে করিলা গমন ॥
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সব লোকের মন ॥

রঙ্গনাথ দর্শনে গৌরাঙ্গদেবের প্রেমাবেশ লক্ষ্য করে পরম বৈষ্ণব বেঙ্কট ভট্ট নিমন্ত্রণ করে গৃহে নিয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন···এই তরুণ সন্ন্যাসী সাধারণ নন। তার প্রতি যথোচিত সেবা করে বেঙ্কট ভট্ট অনুরোধ করলেন তাঁর গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করবার জন্য। এমন পবিত্র চতুর্দশীর দিন গৃহে পরম বৈষ্ণবের অবস্থান··· বেঙ্কট ভট্ট বললেন—তুমি কৃপা করে এমন পবিত্র দিনে এসেছো···তোমার মুখ থেকে কৃষ্ণ কথা শুনবো। দিবা রাত্রি কৃষ্ণ রসে অতিবাহিত করবো।

চতুর্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণ কথা কহি কৃপায় উদ্ধার আমারে ॥

সুখে সময় অতিবাহিত হতে লাগলো। গৌরাঙ্গদেব কাবেরী নদীতে স্নান সমাপন শেষে শ্রীরঙ্গ দর্শন করেন। প্রতিদিন প্রেমাবেশে কীর্তন করেন নৃত্য করে। তাঁর

কীর্তনে নৃত্যে প্রেমবিকার দর্শন করে মুগ্ধ হয় সর্ব লোক। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে গৌরাঙ্গদেব দর্শনের আশায়।

সৌন্দর্যাদি প্রেমাবেশ দেখি সর্বলোক।
দেখিবারে আইসে লোকে খণ্ডে দুঃখশোক॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইলা নানা দেশ হৈতে।
সব কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুকে দেখিতে॥
কৃষ্ণ নাম বিনা কেহ নাহি কহে আর।
সবে কৃষ্ণ ভক্ত হৈল লোকে চমৎকার॥

একদিন গৌরাঙ্গদেব শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির দর্শন শেষে লক্ষ্য করলেন—এক ব্রাহ্মণ দেবালায় বসে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করছেন। তাঁর সংস্কৃত উচ্চারণে ভুল, অশুদ্ধ পাঠ শুনে কেউ কেউ উপহাস করছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিবিষ্ট মনে গীতা পাঠ করে যাচ্ছেন।

অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন লোক করে উপহাসে॥
কেহ হাসে কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত মনে॥

পাঠ করতে করতে তাঁর দেহে অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল। বিস্মিত হলেন গৌরাঙ্গদেব। আনন্দে তাঁর মন ভরে গেল। তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রাহ্মণ, তুমি গীতা পাঠ করো। পাঠের সময় কোন অর্থ উপলব্ধি করে এত সুখ পাও?

ব্রাহ্মণ বললেন—আমি পাঠ করি মাত্র। আমি মূর্খ, শ্লোকের শব্দার্থ মাত্র জানি না।

গৌরাঙ্গদেব বিস্মিত হলেন—সে কি?

হ্যাঁ, গুরু আজ্ঞায় আমি পাঠ করি মাত্র। তবে পাঠ করবার সময় দেখতে পাই অর্জুনের রথে অধিষ্ঠিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথের রজ্জু ধরে আছেন। অর্জুনকে সেই শ্যামল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ হিত উপদেশ দান করছেন। এই দর্শনেই আমার অপার

আনন্দের আবেশ সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ আমি পাঠ করি ততক্ষণই এই দৃশ্য দর্শন করি। দেহ মন পুলকিত হয়। অপার আনন্দ অনুভব করি।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—গীতা পাঠে তোমারই অধিকার আছে। গীতার সার অর্থ তুমিই উপলব্ধি করেছো।

প্রভু কহে গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি যে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুপদে ধরি বিপ্র করেন রোদন॥
তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ হেন তুমি মোর মনে লয়॥

শ্রীরঙ্গনাথে বেঙ্কট ভট্টের আলয়ে গৌরাঙ্গদেব নিরন্তর কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করলেন। ভট্টের সঙ্গে সখ্যতা জন্মেছে। দুই সখা নিরন্তর হাস্যপরিহাস করেন। একদিন গৌরাঙ্গদেব হেসে বললেন—ভট্ট, তুমি নিরন্তর নিষ্ঠাভাবে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা কর। তোমার ভক্তি দেখে আমারও দেহে মনে অপার আনন্দ জাগে। কিন্তু একটা কথা—নারায়ণের বক্ষস্থিতা লক্ষ্মী পতিব্রতা। সেই সাধ্বী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সর্ব সুখ ভোগ ত্যাগ করে কেন আমার ঠাকুর কৃষ্ণ, যার গোপ আচরণ, তার সঙ্গলাভের জন্য ব্রত নিয়ম করে তপস্যা করেছেন কেন?

ভট্ট হেসে বললেন…সখা, তোমার কৃষ্ণ আর আমার নারায়ণ অভিন্ন, এক স্বরূপ। নারায়ণের তুলনায় কৃষ্ণের লীলা অধিক, লীলা রূপেরও পরিসীমা নেই। তার বিদগ্ধরূপে মুগ্ধ লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গ বাঞ্ছা করেছেন। এতে পতিব্রতা ধর্মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। কৃষ্ণ সঙ্গলাভে পতিব্রতা ধর্ম নাশ হয় না। কৃষ্ণ পেলে রাসবিলাসে অধিক লাভ পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। এতে দোষ কিসের বল?

গৌরাঙ্গদেব হেসে বললেন:

প্রভু কহে দোষ নাহি ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা জানি॥

গৌরাঙ্গদেব বললেন—গোপীগণ কৃষ্ণসঙ্গ পেলেন…রাসলীলায় গোপীদের

অধিকার ছিল। কিন্তু নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মী কেন কৃষ্ণসঙ্গ পেলেন না তার কারণ আমাকে বল।

ভট্ট বললেন ঃ

* * *

ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥
আমি জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্র গভীর ॥

ভট্ট বললেন—তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, কৃষ্ণের লীলা…তুমি নিজে না জানালে কি করে জানবো ?

গৌরাঙ্গদেব হেসে বললেন—কৃষ্ণের স্বভাব—আপন মাধুর্যে সর্বচিত্ত আকর্ষণ করা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সঙ্গ পেয়েছেন ব্রজগণ কৃষ্ণ ঈশ্বর জ্ঞানে নয়। কেউ তাঁকে পুত্রজ্ঞানে স্নেহ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, কেউ কেউ সখাজ্ঞানে কাঁধে চড়ে খেলা করেছে, সখ্যতার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, কৃষ্ণকে সবাই তাই ব্রজেন্দ্রনন্দন বলেই জানে।

ব্রজেন্দ্রনন্দন তারে জানে ব্রজজন
ঐশ্বর্য জ্ঞানে নাহি সম্বন্ধ মানন ॥
ব্রজলোকে ভাবে যেই করয়ে ভজন
সেই ব্রজে পায়ে শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

গোপীগণ তাই ব্রজেশ্বরী সুত বলে ভজনা করেছে গোপীভাব নিয়ে। সেই ভাব সেই দেহ নিয়েই গোপীগণ রাসলীলার অধিকার লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণ গোপ-জাতি, গোপীগণও সেই জাতির প্রেয়সী। কৃষ্ণ তাই অন্য স্ত্রী, অন্য দেবীর সঙ্গলাভ করতে চাননি। লক্ষ্মী নারায়ণের প্রেয়সী। নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাসমূর্তি। তাই গোপীরাগানুগতা না হয়ে লক্ষ্মী কৃষ্ণভজনা করেছেন

অন্য দেহে না পাইয়া রাস বিলাস।
অতএব নায়ংশ্লোক কহে বেদব্যাস ॥

বেঙ্কট ভট্টের মনে গর্ব ছিল যে তিনি স্বয়ং নারায়ণের সেবক। তাঁর ভজনাই শ্রেষ্ঠ···সেই বৈষ্ণব ভজনাই সর্বোপরি ভজনা।

গৌরাঙ্গদেব পরিহাসচ্ছলে বেঙ্কটভট্টের গর্বের ভাবকে খণ্ডন করলেন। তবে এই আলোচনায় মনে দুঃখ পাবেন অনুভব করে গৌরাঙ্গদেব বললেন—তোমার ভজনায় কোন সংশয় নেই। নারায়ণ-কৃষ্ণ এক। কৃষ্ণের বিলাসমূর্তি নারায়ণ। সেই বিলাস-মূর্তিধারী কৃষ্ণের প্রেয়সী লক্ষ্মী। কৃষ্ণের লীলার পরিসমাপ্তি নেই, তাই লক্ষ্মী কৃষ্ণ সঙ্গের তৃষ্ণা অনুক্ষণের জন্য। কৃষ্ণের যে ভগবত্ত্ব···লক্ষ্মীর মনকে আকর্ষণ করেছিল। তেমনি গোপীগণের মন নারায়ণকে আকর্ষণ করতে পারে না। নারায়ণের কী কথা, কৃষ্ণ গোপীগণকে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ দর্শন করিয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণের সেই রূপ আকর্ষণ করতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে গৌরাঙ্গদেব বেঙ্কট ভট্টের গর্ব ভেঙে দিলেন। গর্ব চূর্ণের জন্য ভক্ত বেঙ্কট ভট্টের মনে বেদনা সংশয় যাতে না জাগে, তাঁর ভাব ভাবনা···সাধন সুখ নিরবচ্ছিন্ন রাখবার জন্য গৌরাঙ্গদেব বললেন—ভট্ট, আমার সিদ্ধান্তে মনে দুঃখ পেয়ো না। তুমি জ্ঞানী, তুমি ভক্ত। শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শ্রবণ করলে বৈষ্ণব বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

কৃষ্ণ-নারায়ণ একই স্বরূপ। গোপী-লক্ষ্মী-স্বরূপে কোন ভেদ নেই। গোপীগণের দেহে লক্ষ্মী কৃষ্ণসুখ আস্বাদন করেন। ঈশ্বরে কোন ভেদ নেই, ভেদ মানলেই বরং অপরাধ। তাই

একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ॥

ভট্ট করজোড়ে বললেন—আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি পামর, আর তুমি সেই কৃষ্ণ, সাক্ষৎ ঈশ্বর। ঈশ্বরের লীলার কিছুই আমি জানি না। লক্ষ্মী নারায়ণের কৃপায় তোমার দর্শন লাভ করেছি। তুমি যা শোনাবে···আমি তাই সত্য বলে মেনে নেবো। কৃষ্ণভক্তি তোমার কৃপায় লাভ করলাম। এই বলে ভট্ট গৌরাঙ্গদেবের চরণ জড়িয়ে ধরলেন। গৌরাঙ্গদেব ভট্টকে আলিঙ্গন করলেন। চতুর্মাস্য পূর্ণ হতেই গৌরাঙ্গদেব ভট্টের কাছ থেকে বিদায় চাইলেন। বেঙ্কট ভট্ট গৌরাঙ্গদেবকে নিয়ে আবার রঙ্গনাথ দর্শন করলেন। দর্শন লাভের পর গৌরাঙ্গদেব বিদায় নিলেন—আকুল হলেন বেঙ্কট ভট্ট, গৌরাঙ্গদেবের বিদায়ে অচেতন হলেন।

এমনি করেই গৌরাঙ্গদেব ঋষভ পর্বতে গিয়ে নারায়ণ দর্শন করলেন। ঋষভ পর্বত মাদুরা থেকে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে নারায়ণ মন্দির রয়েছে। সেখান থেকে শ্রীশৈলে শিব দুর্গা দর্শন করলেন। এমনি করেই গৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণা জেলায় কামকোষ্ঠি গেলেন। কামকোষ্ঠির নাম কানপল্লী বা কাবালী। সেখানে শিবদুর্গা-বেশী দুই ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁদের সঙ্গে নিভৃতে কৃষ্ণসঙ্গ আলোচনা করলেন। কামকোষ্ঠি থেকে গৌরাঙ্গদেব পৌঁছে গেলেন দক্ষিণ মথুরায়। দক্ষিণ মথুরা বর্তমান মাদুরা। মাদুরায় রামদাস নামে একজন পরম রামভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে গৌরাঙ্গদেবকে তাঁর কুটিরে নিয়ে গেলেন। আতিথ্য গ্রহণ করলেন গৌরাঙ্গদেব। রামদাস বিরক্ত ভক্ত। কুটিরে সারাদিন অতিবাহিত করবার পর গৌরাঙ্গদেব বললেন ...সারাদিন চলে গেল—মধ্যাহ্ন সময়, রান্নার কোন ব্যবস্থা নেই দেখছি।

রামদাস বললেন—আমি বনবাসে আছি। অরণ্যে বাস, পাকসামগ্রী বনে পাওয়া যায় না। বন থেকে শাক ফল নিয়ে আসবে লক্ষ্মণ। তবে সীতা রান্না করবেন। গৌরাঙ্গদেব তুষ্ট হলেন রামদাসের সাধন ভজনের ধারা লক্ষ্য করে। এমন বিস্ময়কর ভক্ত আছেন জগতে! তৃতীয় প্রহরে ব্রাহ্মণ গৌরাঙ্গদেবকে অতি যত্নে ভোজন করালেন—কিন্তু নিজে উপবাসী রইলেন।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—তুমি উপবাসী রইলে যে?

রামদাস বলল—আমি অগ্নিতে দেহত্যাগ করবো।

সে কি! চমকে উঠলেন গৌরাঙ্গদেব।

মহালক্ষ্মী সীতাকে রাক্ষস স্পর্শ করেছে—তাই—

এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥

গৌরাঙ্গদেব বিস্মিত হয়ে বললেন—তুমি ভক্ত, বিজ্ঞজন। পণ্ডিত হয়ে তোমার এ ভাবনা কেন? সীতাদেবী ঈশ্বর-প্রেয়সী—চিদানন্দ মূর্তি। তাঁর প্রাকৃত ইন্দ্রিয় স্পর্শ করা তো দূরের কথা, দর্শন পর্যন্ত পায় না। সীতার আকৃতিযুক্ত মায়াসীতা হরণ করলেন রাবণ! এই হল বিচার।

**অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥**

রামদাস, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস রাখো। মনে কখনো কুভাবনা রাখবে না। ভোজন করে ব্রাহ্মণ জীবন রক্ষা করলো। তাঁকে আশ্বাস দান করে গৌরাঙ্গদেব কৃতমালায় স্নান করলেন। কৃতমালা—মাদুরার সন্নিকটে বেগাই বা বেগবতী নদী। সেখান থেকে পৌঁছে গেলেন দুর্বেসন। দুর্বেসন রামনাদের পাঁচ মাইল দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলে রঘুনাথ মন্দির। রঘুনাথ মন্দিরে শেষশায়ী চতুর্ভুজ ভগবান মূর্তি। রঘুনাথ দর্শন করে গৌরাঙ্গদেব পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে মহেন্দ্র শৈলে পরশুরাম বন্দনা করলেন। মহেন্দ্র শৈলে পরশুরামের মন্দির সম্ভবতঃ কন্যাকুমারীর প্রায় ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মহেন্দ্রগিরির সন্নিকটে অবস্থিত।

সেখান থেকে পদব্রজে গৌরাঙ্গদেব পৌঁছে গেলেন সেতুবন্ধে। সেতুবন্ধে বিখ্যাত রামেশ্বরের মন্দির। সেতুবন্ধে এসে প্রথম ধনুস্তীর্থে সমুদ্রস্নান করলেন। ধনুস্তীর্থের বর্তমান নাম ধনুষ্কোটি। বর্তমানে সেই ধনুষ্কোটি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। ধনুস্তীর্থ থেকে এসে রামেশ্বরে বিশ্রাম নিলেন গৌরাঙ্গদেব।

রামেশ্বরমে অবস্থান কালে গৌরাঙ্গদেব ব্রাহ্মণ সভায় কূর্মপুরাণ শ্রবণ করলেন। তার মধ্যে পতিব্রতা উপাখ্যান পাঠ শুনলেন। পতিব্রতা শিরোমণি সীতা জগতের মাতা, রামের ঘরণী। রাবণ তাঁকে হরণ করতে এলে সীতা অগ্নির শরণ নিলেন। অগ্নি এসে সীতার আবরণ সৃষ্টি করায় মায়াসীতা হরণ করে চলে গেল রাবণ। সীতাকে নিয়ে অগ্নি পার্বতীর স্থানে রেখে এলেন। মায়াসীতা দিয়ে অগ্নি রাবণকে বঞ্চনা করেছিল। রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করে মায়াসীতা নিয়ে এলেন অযোধ্যায়, অগ্নিপরীক্ষায় মায়াসীতা অন্তর্ধান করলো, সত্য সীতা দর্শন দিলেন।

এই সিদ্ধান্তে গৌরাঙ্গদেব আনন্দিত হলেন। তিনি এইরূপ লিখিত সিদ্ধান্ত নিয়ে মাদুরায় গিয়ে রামদাসের হাতে দিলেন। লিপি পাঠ করে রামদাস আনন্দিত হলেন। গৌরাঙ্গদেবের পদস্পর্শ করে ক্রন্দন করলেন। বললেন—

বিপ্র কহে—তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন॥

ভাগ্যবলে তোমাকে আবার কাছে পেয়েছি। আজ তোমাকে ভাল ভাবে রান্না করে উত্তম ভোজন করাবো।

সেই রাত্রি রামদাসের কাছে অবস্থান করে, প্রত্যুষে পদযাত্রা শুরু করলেন।

এমনি করে গৌরাঙ্গদেব তাম্রপর্ণী নদী তীরে পৌঁছে সেখানে স্নান করলেন।

সেখান থেকে চিয়ড়তালা তীর্থে পৌঁছে রাম লক্ষ্মণ দর্শন করলেন। তার পর তিলকাঞ্চীতে শিব দর্শন করলেন। আরো দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে গজেন্দ্র মোক্ষমে বিষ্ণু দর্শন করে পৌঁছে গেলেন পানাগড়ি তীর্থে। সেখানে সীতাপতি রঘুনাথ দর্শন করে মলয় পর্বত পৌঁছে অগস্ত্য বন্দনা করলেন। তার পরই বিখ্যাত কন্যাকুমারী। কন্যাকুমারীতে মন্দির দর্শন করে মুগ্ধ হলেন গৌরাঙ্গদেব। সুদূর নীলাচল থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে পদার্পণ করে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে আমলিতলা, মল্লার দেশ, বেতাপাণি, পয়স্বনী অনন্ত পদ্মনাভ, সিংহারি মঠ, মৎস্য তীর্থ দর্শন করলেন। শেষে গৌরাঙ্গদেব পাণ্ডুপুরে পৌঁছে গেলেন। এই পাণ্ডুপুর তাঁর শৈশব থেকেই শোনা। সেখানে বিঠল ঠাকুর এসে সাক্ষাৎ করলেন। তার গৃহে অবস্থান করতেই শুনলেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরীর কথা।

শ্রীরঙ্গপুরী এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করছেন। গৌরাঙ্গদেব সেখানে গিয়ে শ্রীরঙ্গ পুরীর পদধূলি নিয়ে প্রণাম করলেন। বিস্মিত হলেন শ্রীরঙ্গ পুরী। উভয়ের দর্শনেই অদ্ভুত প্রেমবিকার। গৌরাঙ্গদেবকে বললেন।—

শ্রীপাদ ধরহ মোর গোসাঞি সম্বন্ধ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥

এই বলে দুজনেই দুজনকে আলিঙ্গন করলেন। ক্ষণিকের আবেশে দুজনই দু চোখের জল যেন বাধা দিতে পারলেন না। সেখানেই অবস্থান করে দিন রাত কৃষ্ণ-কথায় অতিবাহিত করলেন। শ্রীরঙ্গ পুরী কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

শ্রীপাদ, তোমার জন্মস্থান কোথায় ?

গৌরাঙ্গদেব বললেন—নবদ্বীপ।

বিস্মিত হলেন শ্রীরঙ্গ পুরী। তাঁর গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরী নদীয়ায়…নবদ্বীপে অবস্থান করেছিলেন জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে। জগন্নাথ মিশ্রের ব্রাহ্মণী অপূর্ব মোচার ঘণ্ট রান্না করে খাইয়েছিলেন। পতিব্রতা ব্রাহ্মণী জগন্মাতার মত স্নেহপরায়ণা। তিনি পুত্রসম সন্ন্যাসীদের স্নেহ করতেন। তাঁরই এক যোগ্য পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে শঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ করেছিলেন। এই তীর্থেই অল্প বয়সে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন।

গৌরাঙ্গদেব বললেন—তোমার সব কথাই ঠিক। জগন্নাথ মিশ্র পূর্বাশ্রমে আমার পিতা। শঙ্করারণ্য আমার ভ্রাতা বিশ্বরূপ।

গৌরাঙ্গদেব সন্ধান পেলেন, এই তীর্থে তাঁর ভ্রাতা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ তাঁর সার্থক হল। এই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করেই এসেছিলেন সুদূর দক্ষিণ দেশে।

নীলাচলে অবস্থানকালে গৌরাঙ্গদেব বলেছিলেন

এবে সবা স্থানে মুঞি মাগো একদানে।
সবে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে॥
বিশ্বরূপ উদ্দেশ্যে অবশ্য আমি যাব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ॥
বিশ্বরূপ সিদ্ধ প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে করেন এ ছল॥

পরিশিষ্ট

গৌরাঙ্গদেব ১৫১০ সনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন মাঘ মাসে। ফাল্গুন মাসেই তিনি নীলাচলে যাত্রা করেন। নীলাচলে তিনি স্বল্পকালই অবস্থান করেছিলেন। ১৫১১ সনে ৭ই বৈশাখ গৌরাঙ্গদেব যাত্রা করেন দক্ষিণ দেশে। তিনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সমাপ্ত করেন ১৫১২ সনে। তাঁর এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বিবরণের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় ঃ—

কবি কর্ণপুর রচিত ১. চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য (সংস্কৃত) আনুমানিক রচনাকাল ১৫৪২ সন

২. চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক (সংস্কৃত) আনুমানিক রচনাকাল ১৫৭২ সন

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্য চরিতামৃত (বাংলা) আনুমানিক রচনাকাল ১৫৮২ সন

গোবিন্দদাস রচিত গোবিন্দদাসের করচা (বাংলা) রচনাকাল জানা যায় না—

কবি কর্ণপুর রচিত চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যের ১২শ ও ১৩শ সর্গে সার্বভৌমের গৃহে গমন। বেদবেদান্ত বিচার ও সার্বভৌমের ভক্তিবাদে বিশ্বাসী হওয়া। গোদাবরী তীর্থে রায় রামানন্দ মিলন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বর্ণনা। ত্রিমল্লে বিভিন্ন তীর্থ দর্শন। রামভক্ত মিলন, শ্রীরঙ্গনাথ তীর্থ দর্শনান্তে গোদাবরী তীর্থে প্রত্যাবর্তন। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের সপ্তম অঙ্কের নাম তীর্থ পর্যটন। গোদাবরী তীর্থ দর্শন, রায় রামানন্দ মিলন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ। কর্ণাটক পতির মল্লভট্ট নামে অমাত্যের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য তীর্থ দর্শন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্য চরিতামৃতে অন্তলীলায় লেখা আছে দক্ষিণ দেশের তীর্থের কথা। বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবতে গৌরাঙ্গদেবের নীলাচল ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তীর্থ দর্শনের উল্লেখ নেই। তবে নিত্যানন্দের দীর্ঘ বিশ বৎসর দক্ষিণদেশের তীর্থ, অন্যান্য স্থানের তীর্থ দর্শনের উল্লেখ রয়েছে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আদি খণ্ডে।

নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥
তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচরে ॥

চৈতন্য ভাগবত। আদি খণ্ড ৬ষ্ঠ, অধ্যায়, পৃঃ ৪৩।

নিত্যানন্দের তীর্থ ভ্রমণে তীর্থস্থানের বিস্তারিত কথা লেখা আছে। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর তীর্থভ্রমণ তাই অনেক তীর্থের কথা দেখতে পাওয়া যায়। বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায় নিম্নলিখিত তীর্থের কথা :

মৎস্য তীর্থ, কাঞ্চীপুর—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিপুতক, বিশালা, পম্পা, ভীমরথী, সপ্তগোদাবরী, বেম্বাতীর্থ, বেঙ্কটনাথ, কামকোষ্ঠিপুরী, শ্রীরঙ্গম, ঋষভ পর্বত, দক্ষিণ মথুরা, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, মলয় পর্বত, অগস্তমলয়, রামেশ্বর সেতুবন্ধ, নৃসিংহ, ত্রিমল্ল, কূর্মনাথ ইত্যাদি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌরাঙ্গদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যে সব তীর্থের কথা লিখেছেন, তার সব তীর্থের কথাই লেখা আছে নিত্যানন্দের তীর্থ ভ্রমণের মধ্যে।

কবিরাজ গোস্বামীর রচনায় দাক্ষিণাত্যের তীর্থগুলির তথ্য সম্ভবতঃ কবি কর্ণপূরের রচনা আর বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল।

গোবিন্দ দাসের করচায় গৌরাঙ্গদেবের দাক্ষিণাত্য তীর্থভ্রমণের কথা লেখা আছে বিস্তারিত ভাবে।

গৌরাঙ্গদেবের ভ্রমণপথের সঙ্গী ছিলেন গোবিন্দদাস। তিনি গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে ভ্রমণের সময় হয়তো দিনপঞ্জী সংগ্রহ করতেন নিয়মিতভাবে। সেই ভ্রমণের পঞ্জীই তাঁর করচা।

গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের দুর্গম পথের সঙ্গী ছিলেন পরিচার হিসাবে। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গদেবের অনুরক্ত ভক্ত। পূর্বে তিনি ছিলেন ঈশ্বরপুরীর পরিচারক। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর রচিত চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে—গৌরাঙ্গদেব একমাত্র ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকেই সঙ্গী করে নিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণদেশে।

কিন্তু কবি কর্ণপুর রচিত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের ৭ম অঙ্কে লেখা আছে—চৈতন্যদেব গোবিন্দদাসকেও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যে। গোবিন্দদাস শূদ্র। চৈতন্যদেবের সঙ্গী করায় অনেকেরই আপত্তি হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের বিন্দুমাত্র আপত্তি হয়নি। সার্বভৌম প্রশ্ন তুলেছিলেন—গোবিন্দদাস শূদ্র। ঈশ্বরপুরী

কেমন করে শূদ্রকে পরিচারক করেছিলেন ?

চৈতন্যদেব এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন নাটকের কথোপকথনের মধ্যে। চৈতন্যদেব বলেছিলেন—স্বতন্ত্র পুরুষ, সেই ভগবান হরি পর্যন্ত জাতিকুল বিচার করেন না। প্রমাণ, ভগবান কৃষ্ণ সুযোধনের অন্ন পরিত্যাগ করে সাগ্রহে বিদুরের ক্ষুদ ভক্ষণ করেছিলেন।

কবি কর্ণপূরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক অনুযায়ী চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন দুজন, একজন কৃষ্ণদাস···তিনি ব্রাহ্মণ, অপরজন গোবিন্দদাস—তিনি শূদ্র।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গোবিন্দদাসের নামের উল্লেখ না থাকায় স্বভাবতই গোবিন্দদাসের করচাকে অপ্রামাণিক বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু ডঃ দীনেশ সেন গোবিন্দদাসের করচাকে অপ্রামাণিক বলেননি। চৈতন্যদেবের সমকালীন কবি কর্ণপুর গোবিন্দদাসকে অস্বীকার করেননি। তবে হয়তো গোবিন্দদাস শূদ্র বলে···গৌরাঙ্গদেবের ভ্রমণসঙ্গী হিসাবে নামের উল্লেখ করতে চাননি চরিতকারগণ। গোবিন্দদাসের করচায় গৌরাঙ্গদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। সাদৃশ্য রয়েছে তীর্থস্থানগুলির উল্লেখের সঙ্গে। তবে বৈষম্য রয়েছে অনেক। সম্ভবতঃ সে যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা না থাকায় নানা বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ত্রুটির কথা স্বীকার করেছেন।

> তীর্থযাত্রার তীর্থক্রম কহিতে না পারি।
> দক্ষিণে বামে হয় তীর্থ গমন ফেরাফেরি॥
> অতএব নামমাত্র করিয়ে লিখন।
> কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥ চৈঃ চঃ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা মুখ্য বিষয় নয়। ভ্রমণ পথের সঠিক নিশানা প্রচ্ছন্ন। পথের কথার চাইতে তীর্থের কথা বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে। গৌরাঙ্গদেব ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সুদূর দাক্ষিণাত্যে দুর্গম পদযাত্রায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাই তাঁর ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে বৈষ্ণব ধর্মের প্রেম ভক্তি রস সিঞ্চন করেছেন দীর্ঘ বন্ধুর বিপজ্জনক পথে পথে। ফলে···সেই সব পথের বহু অবৈষ্ণব মানুষ হয়েছেন বৈষ্ণব, অনেক বিধর্মী

ধার্মিক হয়েছেন।

গোবিন্দদাসের করচায় ভ্রমণের কথা আছে। ভ্রমণে তাই ভৌগোলিক তথ্য মূল্যবান। আজ থেকে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে দক্ষিণ দেশের অনেক স্থানের নাম পরিবর্তিত হয়েছে। স্বভাবতঃই ভ্রমণের দূরত্ব সংক্ষিপ্ত হয়েছে যান্ত্রিক যুগের যান-বাহনের দৌলতে।

গোবিন্দদাসের করচায় লেখা আছে—চৈতন্যদেব নীলাচল পরিত্যাগ করে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমে আলালনাথে নারায়ণ মূর্তি দর্শন করে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে ভাবাবেশে অজ্ঞান হলেন। তার পর সেখান থেকে পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পৌঁছে গেলেন গোদাবরী তীর্থে। সেখানে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন হল সার্বভৌমের অনুরোধে। সেখানে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব আলোচনা ভাব বিনিময়ের পর বললেন—

প্রভু কহে, রামানন্দ এবে আমি যাই।
নীলাচলে গিয়ে তুহু থাকো মোর ঠাই॥
তুমি, আমি, আর ভট্ট থাকি নিরজনে।
আলোচিয়া কৃষ্ণ তত্ত্ব জুড়াবো জীবনে॥
এত বলি প্রভু রায়ে দিলেন বিদায়।
প্রণমিয়া রামানন্দ গৃহে চলে যায়॥
প্রভুর সঙ্গেতে রায় যতেক কহিল।
তাহার শতাংশ এহি গ্রন্থে না রহিল॥ গোঃ করচা।

১৪৫৪ সনে উড়িষ্যার গজপতি বংশের অধীনে এসেছিল রাজমহেন্দ্রী। ১৪৫৮ সনে এই রাজ্যের একজন মন্ত্রী এ স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৪৭০ সনে কুলবর্গের মুসলমান নবাব রাজমহেন্দ্রী দখল করে নেয়। পরে অবশ্য ১৫০০ সনে হৃত রাজ্য উদ্ধার করেন হিন্দু রাজা। রায় রামানন্দকে এই অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করে-ছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রদেব।

১৫১৫ সনে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব প্রতাপরুদ্রদেবকে পরাভূত করলেন কোণ্ডপাল্লী (মসলীপত্তনের নিকটে)। কিন্তু রাজমহেন্দ্রী তখনো প্রতাপরুদ্রদেবের অধীনে ছিল। ১৫৪১ সন পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল প্রতাপরুদ্রদেবের বংশদের অধীনে। অবশ্য তিরিশ বৎসর পর ১৫৭১ সনে গোলকুণ্ডার মুসলমান সম্রাট দখল করলেন।

রাজমহেন্দ্রী। (Godavari Gazetteer P. 27-28-)

রাজমহেন্দ্রীর নিকটে অবস্থিত ছিল ত্রিমন্দ নগর। এই দুইটি স্থানের দূরত্ব ছিল ১৮ মাইল। ত্রিমন্দ সে যুগে বৌদ্ধদের মঠ ছিল। রাজমহেন্দ্রী ছিল হিন্দু তীর্থ-স্থান।

রামানন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৌরাঙ্গদেব ত্রিমন্দে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনা, বিচার মীমাংসায় মুগ্ধ হয়ে বৌদ্ধগণ বৈষ্ণব হন। এই ত্রিমন্দে ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত শাস্ত্রে পণ্ডিত ঢুণ্ডিরাম তীর্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় ব্যপৃত হতেই গৌরাঙ্গদেব সবিনয়ে বললেন

মুরখ সন্ন্যাসী মুহি কিছু নাহি জানি।
বার বার তোমার নিকটে হার মানি। গোঃ করচা।

ঢুণ্ডিরাম তীর্থ তবু তাঁকে অব্যাহতি দিলেন না। অবশেষে গৌরাঙ্গদেবের ভক্তিবাদের কাছে অবনত হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। গৌরাঙ্গদেব তাঁর নাম দিলেন হরিদাস।

ত্রিমন্দ ত্যাগ করে পদব্রজে সিদ্ধবটেশ্বর পৌঁছে গেলেন। সেখানে অক্ষয় বট-দর্শন করে শিবের স্তব স্তুতি করলেন। সিদ্ধবটেশ্বর কুদ্দপার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত।

Siddhai vattan or Siddhout is the head quarter of the Taluk in Cuddapah District. In the past there were three temples—Siddhesvarasvami Siddhavatesvarasvami and Ranganathasvami. After Mahamedan occupation in about 1750 A.D. these temples were dismantled and the idols removed and installed in the fresh temples Cuddapah Gazetteer.

সিদ্ধবটেশ্বরে সাত দিন অতিবাহিত করবার পর গৌরাঙ্গদেব নন্দীশ্বরে পৌঁছে গেলেন। নন্দীশ্বর সিদ্ধবটেশ্বর থেকে প্রায় আট ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বে নন্দপুরে অবস্থিত। সেখানে সৌম্যনাথ স্বামীর প্রাচীন মন্দির রয়েছে।

The temple of Soumyanathasmai at Namdalar in of immense antiquity and was formerly held in great repute. It

contains on its walls and elsewhere no less than fifty four inscriptions dating from the 11th century to Viyayanagar times from which much information of historical value has been gleaned : Duddopah Garetteer.

সেখান থেকে দশ ক্রোশ পর্যন্ত বিস্তৃত গভীর অরণ্য অতিক্রম করে গৌরাঙ্গদেব মুন্নানগরে পৌঁছে গেলেন। সেখানকার অধিবাসীরা গৌরাঙ্গদেবের কীর্তন ও ভাবাবেশে মুগ্ধ হল। তাঁদের কাছ থেকে অন্ন বস্ত্র ভিক্ষা করে দরিদ্রদের মধ্যে দান করলেন। সকাল বেলায় মুন্নানগর ত্যাগ করে তিনি বেঙ্কটনগর পৌঁছে গেলেন দ্বিপ্রহরে। বেঙ্কটগিরি নন্দপুরের ১৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। মুন্নানগর থেকে নন্দীশ্বর দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, মুন্নানগর থেকে বেঙ্কটগিরির দূরত্ব ৬ ক্রোশ। ছ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে গৌরাঙ্গদেব দ্বিপ্রহরে পৌঁছে গেলেন বেঙ্কটগিরি থেকে ১২ ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে ত্রিপদী ত্রিমল্ল।

বেঙ্কটগিরির সন্নিকটেই বগুলা অরণ্য। গভীর অরণ্য অতিক্রম করবার পরই গিরিশ্বর, তারপর ত্রিপদী ত্রিমল্ল। বেঙ্কট নগরে গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে অদ্বৈতবাদী রামানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ হল। স্বভাবসুলভ দৈন্য প্রকাশ করে গৌরাঙ্গদেব বিনাতর্কে পরাজয় স্বীকার করলেন রামানন্দের কাছে। তবু রামানন্দ ছাড়লেন না। তিনি কিন্তু তর্কে অবতীর্ণ হলেন। অবশেষে তর্কে পরাভূত হয়ে ভক্তিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। বেঙ্কট নগরে তিন দিন অতিবাহিত করতে হল গৌরাঙ্গদেবকে। তারপর বগুলা অরণ্যে পন্থ ভীল দস্যুদের হরিনাম কীর্তন শ্রবণ করিয়ে বৈষ্ণবে রূপান্তিত করলেন। এই সময়ে তিনি তিনদিন ভাবাবেশে অনাহারে রইলেন। তারপর দর্শন করলেন গিরিশ্বর শিব। বিল্বপত্রে পূজো সম্পন্ন করে গৌরাঙ্গদেব ত্রিপদে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে একজন মৌনী সন্ন্যাসীকে ভক্তিবাদে বিশ্বাসী করলেন। ত্রিপদি অর্থাৎ তিরুপতির বিগ্রহ দর্শন করে মুগ্ধ হলেন। সেখান থেকে প্রায় দুশো মাইল উত্তর-পূর্বে অগ্রসর হয়ে পৌঁছে গেলেন পানা নরসিংহে। নৃসিংহ দেবতাকে স্তব স্তুতি করলেন তিনি।

(পানা নরসিংহ সম্পর্কে গোবিন্দদাসের করচায় ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে হয়তো তথ্যের অভাব রয়েছে। গৌরাঙ্গদেব গোদাবরী তীর্থ ভ্রমণের পর পানা নরসিংহ দর্শন করেছিলেন। পানা নরসিংহ অর্থাৎ মদনগিরি বেজওয়াদা থেকে ৭ মাইল দক্ষিণে। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর রচনায় লিখেছেন—গৌরাঙ্গদেব ত্রিপদী থেকে গিয়েছেন পানা নরসিংহে, সেখান থেকে গিয়েছেন কাঞ্চীতে। রাজমহেন্দ্রী

থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বেজওয়াদা, সেখান থেকে অন্ততঃ ২০০ মাইল দক্ষিণে তিরুপতি।)

গৌরাঙ্গদেব পানা নরসিংহ থেকে দুশো আশী মাইল দক্ষিণে বিষ্ণুকাঞ্চীতে পৌছে লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি দর্শন করলেন ভবভূতি শেঠের গৃহে। এই স্থান থেকে ছয় ক্রোশ দূরে দর্শন করলেন ত্রিকালেশ্বর শিব। (বিষ্ণুকাঞ্চীর পশ্চিমে শিবকাঞ্চী। সেখানে একাম্রনাথ শিব, সেখানে রয়েছে শঙ্করাচার্যের সমাধি। গোবিন্দদাসের করচায় এ সবের উল্লেখ নেই। ত্রিকালেশ্বর শিব ও গৌরী সম্ভবত শিবকাঞ্চীর একাম্রনাথ ও কামাখ্যা দেবী।)

ত্রিকালেশ্বর থেকে গৌরাঙ্গদেব পদব্রজে অগ্রসর হয়ে পৌছে গেলেন ভদ্রানদীতে। ভদ্রানদীতে স্নান করবার পূর্বে পক্ষগিরির নিম্নে পক্ষীতীর্থে গিয়েছিলেন। পক্ষাতীর্থ চিঙ্গলপুটের দক্ষিণ-পূর্বে, মহাবলীপুরমের সন্নিকটে অবস্থিত। পক্ষীতীর্থের বর্ণনা দিয়েছেন জলধর সেন তাঁর 'দক্ষিণাপথ' গ্রন্থে।

"মন্দিরের দেবীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। সেখানে পূজা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরের পাশেই যে স্থান একেবারে গাছপালা শূন্য সেখানে গেলাম। পাহাড়ের একটু নীচেই কয়েকটা গাছ আছে, আর একটি চালা বাঁধা আছে। শুনলাম—এগারোটার পর একজন পুরোহিত উপরের মন্দিরের পূজা শেষ করে পক্ষীর জন্য খাদ্য নিয়ে আসবেন। তারপর মন্ত্র পাঠ করে আহ্বান করলে পক্ষী দুটি আসবে। পুরোহিত দাঁড়িয়ে উত্তর পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ চারদিকে মুখ করে যোড় হস্তে পক্ষীকে আহ্বান করে পিঁড়ির উপরে উপবেশন করলেন এবং জপ করতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, দূর সমুদ্রের দিক থেকে কি যেন একটা আসছে। তখনও সেটা যে পাখী তা বুঝতে পারা গেল না। সে দিকে পাহাড় বা অরণ্য কিছুই নাই, শুধু মাঠ। একটু পরেই দেখলাম সেই দূরদৃষ্ট বস্তুটি একটি পাখী। পাখীটা উড়ে এসে পুরোহিতের অনতিদূরে বসল। তখন দূর পশ্চিম দিক থেকে আর একটি পাখী আসছে দেখা গেল। সেটিও এসে পূর্বটির পার্শ্বে বসল। পুরোহিত তখন দুইটি বাটিতে খাদ্য পরিবেশন করছিলেন। পাখী দুইটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আহার করতে লাগল। তারা একেবারে পুরোহিতের সম্মুখে এল। পুরোহিতও মধ্যে মধ্যে হাতে করে তাদের মুখে খাদ্য তুলে দিতে লাগলেন। পাখী দুইটি শ্বেতকায় শকুনি, বাচ্চা নয়। বয়স বেশী হয়েছে। সাধারণ শকুনি হইতে আকারও বড়। পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যেই আহার শেষ হয়ে গেল। পক্ষী দুইটি দূর সমুদ্রের দিকে চলে গেল। পুরোহিত বললেন যে—ইহারা দুইজন দেবতা, অগস্ত্য মুনির সন্তান।

একজন রামেশ্বর থাকেন, আর একজন গঙ্গোত্রীতে থাকেন।”

পক্ষী তীর্থের নিকটে ভদ্রানদী (বুত্নর) থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে কালতীর্থ বরাহ-দেবের মন্দির দর্শন করে মুগ্ধ হন গৌরাঙ্গদেব। কবিরাজ গোস্বামী বৃদ্ধকোলের উল্লেখ করেছেন, সেখানে বরাহ মূর্তি দর্শন করেছেন গৌরাঙ্গদেব। বৃদ্ধকোলে সমুদ্র তীরবর্তী মহাবলীপুরম্। মহাবলীপুরমকে সাধারণতঃ সপ্তরথ মন্দির বলা হয়। সেখানে পর্বতগাত্রে…পাথরের ওপরে অনেক মূর্তিই ক্ষোদিত। মাদ্রাজ থেকে ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত মহাবলীপুরম। সেখানে প্রত্যেক মন্দির গাত্রেই নানাবিধ ফুল-ফল, নানা পৌরাণিক দৃশ্যসমূহের অপূর্ব ভাস্কর্যের স্বাক্ষর রয়েছে। কোন কোন মন্দির গাত্রে অর্জুনের কঠোর তপস্যার চিত্র, কোনটিতে বা বামন ভিক্ষা, শেষ নাগ আরোহণে বিষ্ণু উপবিষ্ট, কোনটিতে শিব পার্বতীর চিত্র। কোন মন্দির গাত্রে বিষ্ণুর বরাহ মূর্তি। এ ছাড়াও রয়েছে বরাহ স্বামীর মন্দির, দুর্গার মন্দির। এটি কঠিন পাথরের গাত্র খোদিত করা মূর্তি…। কালতীর্থ থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে ভদ্রা ও নন্দা নদীর (বুত্নরে—পালা ও চেয়ূরের) সঙ্গম স্থলে গৌরাঙ্গদেব স্নান করেন। সেখানে অদ্বৈতবাদী সদানন্দ পুরীকে অভিষিক্ত করে ভক্তিবাদে। সেখান থেকে চাঁই পল্লী তীর্থে (ত্রিচিনোপল্লীর বহু দূরে উত্তর-পূর্বে চিদম্বরমের দক্ষিণে, মায়াবরমের উত্তর-পূর্বে শিয়ালীর নিকটে) শতবর্ষ বয়স্কা সিদ্ধেশ্বরী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় গৌরাঙ্গদেবের। নদী তীরে শৃগালী ভৈরবী মূর্তি দর্শন করে দক্ষিণে কাবেরী নদীতে (সম্ভবতঃ শিয়ালীর দক্ষিণে মায়াবরমে কিংবা মায়াবরমের পূর্বে) সমুদ্র উপকূলে কাবেরীপত্তমে স্নান করেন।

Ablutions in the Cavery at thia Place are considered to confer special benifit.

Kavery Patnam is a little hamlet at the mouth of the Kaveri. It is the same as the Kamara of the periplus and the Khaberis of Ptolemy, and was once one of the chief cities of the Chola Kingdom. It is still, however a famous bathing place since the secred Kaveri reaches the sea here. Tanjore Gezetteer. P. 256-7.

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে চাঁই পল্লীই ত্রিচিনো পোলি। গৌরাঙ্গদেব ত্রিচিনো পোলির তিন মাইল দূরে শ্রীরঙ্গম দর্শন করেছেন।

Tiru-Chinna-Palli = Holy little Town : Trichinopoly Gazetteer.

ত্রিচিনো পোলি জেলায় চিন্ন শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। তদনুযায়ী ত্রিচিনোপোলি—ক্ষুদ্র নগর। শিয়ালী নগরের কাছেই ছোট্ট একটি পল্লীর নাম চিন্নপল্লী। গোবিন্দ তাঁর করচায় একেই চাই পল্লী বলে উল্লেখ করেছেন।

ডাঃ নাগরাজ শর্মার মতে—Shyali stands thirty-two miles from Kumbokonam. The legond is that a demon took shape as a she fox or jackal (srigalii) and Bhairari Debi killed her. The legend lacks textual testtimony or independent corroboration.

একটি দৈত্য শৃগালীরূপ ধারণ করে নগরবাসীদের হত্যা করতো। ভৈরবীদেব তাকে বধ করে সবাইকে বিপদ থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাঞ্জোর গেজেটিয়ার অনুযায়ী দেখা যায়—তিরুজ্ঞান সম্বরদার নামা শৈব উপাসক সপ্তম শতকে শিয়ালীতে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি শৈশবে শিয়ালী দেবীর দুগ্ধ পান করতেন।

গৌরাঙ্গদেব এই সব মন্দির দর্শন করে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে পৌছে যান নাগর নগরে—নাগর নিগা পট্টমের উত্তরে অবস্থিত। নাগরে রাম লক্ষ্মণের মন্দির দর্শন করেন। নাগরে কিন্তু বর্তমানে রাম লক্ষ্মণের মন্দির দেখতে পাওয়া যায় না। তবে গৌরাঙ্গদেবের পরবর্তী সময়ে মুসলিম অত্যাচারে এই সব মন্দির হয়তো ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। নাগরের আরো দক্ষিণে নাগপট্টম। গোবিন্দ সম্ভবত নাগ পট্টমকেই নাগর বলে উল্লেখ করেছেন। নাগরে একটি বিষ্ণু মন্দির আছে··· এই নাগরের আর এক নাম পুন্নগরনম্। নাগরপট্টমে একটি বিষ্ণু মন্দির রয়েছে। নাগরপট্টমের সান্নিকটে রামচন্দ্রের মন্দির আছে। নাগর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল পশ্চিমে তাঞ্জোরে পৌছে গৌরাঙ্গদেব ধনেশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দর্শন করে ভাবে বিহ্বল হয়েছিলেন। পরে গো সমাজ শিব দর্শন করেন। তাঞ্চন নামে এক মহা শক্তিশালী অসুর স্থানীয় নগরবাসীদের ভীতির সঞ্চার করেছিল।

ভগবান বিষ্ণু এই অসুর বধ করেছিলেন বলে স্থানের নাম তাঞ্জোর। এখানেই বৃহদীশ্বর স্বামী শিব প্রতিষ্ঠিত। কাছেই বিশাল নদী। তাঞ্জোরের শিব মন্দিরে রয়েছে বিশাল শিবলিঙ্গ। মন্দির প্রাঙ্গণে শিব শক্তির বিভিন্ন মূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে। তাঞ্জোরের চার ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে তিরুবাদী নগর। তিরুবাদী শিবের নন্দীর বিবাহ হয়েছিল তিরুমলবাদী নগরে। এই বিবাহ উপলক্ষ করে প্রতি বৎসরই

উৎসব হয়। এই উৎসব তেরোদিন ধরে চলে। প্রতি বৎসরই চৈত্র মাসে একটি মিছিল সাতটি শিব মন্দির প্রদক্ষিণ করে। সাতটি শিবমন্দির সন্নিহিত গ্রামগুলিতে অবস্থিত (সপ্ত স্থলম)।

গৌরাঙ্গদেব গো-সমাজ শিবদর্শন করেছিলেন তিরুবাদীনগরে। সেখান থেকে আট ক্রোশ উত্তর-পূর্বে কোম্বকনম্ বা কুম্ভকর্ণকর্পর সরোবর। (কুম্বকোনম মহাস্থথম্ সরোবর) সরোবর দর্শন করে গৌরাঙ্গদেব বিস্মিত হয়েছিলেন।

কুম্ভকর্ণকর্পরেতে সরোবর হয়।
সরসী দেখিয়া প্রভু মানিলা বিস্ময়॥

ডঃ নাগরাজ শর্মার মতে—Kunbhaghonan has absolutely nothing to do with Kunbhakara. Kunbhr means a poet, Gqona —nose, here indicates neck. Kunbhaghonona is thus the Sacred sports where the nector pot flowing in cosmic flood stood still after, the snbsiding of inundation and where it was pierced by Lord Shiva by means of an arrow.

এখানে শার্ঙ্গপাণি বিষ্ণু, কুম্ভেশ্বর শিব, রামস্বামী বিষ্ণু ও চক্রপানি বিষ্ণুর মন্দির আছে। এই সরোবরকে মহামক্কম (মহামোক্ষম বা মহামাঘম্) সরোবর বলা হয়। প্রতি বারো বৎসর অন্তর অন্তর মাঘ মাসে স্নান হয়, সেই উপলক্ষে অসংখ্য যাত্রী সমাগম হয়।

গৌরাঙ্গদেবের বিস্ময়—কুম্ভকর্ণের মাথার খুলিতে এত বড় সরোবর হল কি করে ? সেই মাথার খুলি এত দূরেই বা এলো কি করে ? এই স্থানটির নাম কুম্ভ-খোনম—তা থেকে কুম্ভকোনম বা কুম্ভকর্ণ, সেই

কুম্ভকর্ণ কপালের দেখি সরোবর।

দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা রাবণ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের সঙ্গে এই সরোবরের কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে করে না। গোবিন্দদাস তাঁর করচায় লিখেছেন—কুম্ভ-কোনমের সন্নিকটে চণ্ডালু পর্বতের গোম্ফায় অনেক সন্ন্যাসী বাস করেন। কিন্তু কার্যত কুম্ভকোনমের কাছাকাছি কোন পর্বত নেই।

কুম্ভ কোনমের ১৬ মাইল উত্তরে জয়কোণ্ড চোলম্‌পুরম্‌ (২৭৬ ফুট) আর প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পচয়মলয় পর্বতশ্রেণী। কুম্ভকোনমের দুই তিন মাইল পশ্চিমে স্বামিমলয় বলে গ্রাম রয়েছে। মলয় শব্দের অর্থ পর্বত। স্বামিমলয় সম্ভবতঃ উচ্চভূমি।

ডঃ নাগরাজ শর্মা বলেন—There is no hill in or near Kunbokonan. Thus four miles from Kunbokonan there is a Swamnalai dedicated to Dandayudhapani (Subrahmanya) and the temple or shrine is situated at an elevation reached by means of sixty steps.

চণ্ডালু পর্বতের সন্নিহিত বনভূমি অতিক্রম করে গৌরাঙ্গদেব পদ্মকোটে পৌছে মন্দিরে অষ্টভূজা ভগবতী দর্শন করেন। সেখান থেকে পৌছে যান ত্রিপাত্রে। ত্রিপাত্রে চণ্ডেশ্বর শিব বিখ্যাত। গৌরাঙ্গদেব শিব দর্শন করে স্তব স্তুতি করেন। সেখানে সাত দিন অবস্থান করে অহর্নিশি কীর্তন করেন মাতোয়ারা হয়ে। তার প্রভাবে সেখানকার অধিবাসীরা বৈষ্ণব হন। ত্রিপাত্র ত্যাগ করে পঞ্চাশ যোজন বনভূমি অতিক্রম করেন এক পক্ষকাল পথ চলার ফলে। সেখানে ত্রিচিনেপালির তিন মাইল উত্তরে শ্রীরঙ্গমে পৌছে যান।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন : "তাঞ্জোর হইতে ৬০ মাইল উত্তর পশ্চিমে পদ্মকোট এবং পদ্মকোট হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণে ত্রিপাত্র এবং ত্রিপাত্র হইতে ৩০০ মাইল বন অতিক্রম করিয়া শ্রীরঙ্গম। ত্রিপাত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে পাওয়া যায়। সার্ভে অফিসের মাদ্রাজের মানচিত্রে শ্রীরঙ্গম কিম্বা ত্রিচিনোপল্লী হইতে তাঞ্জোর ৩২।৩৩ মাইল পূর্বে।"

গৌরাঙ্গদেব সম্ভবতঃ তিরুবাদী (গোসমাজ শিব স্থান) থেকে প্রায় ১৬ মাইল উত্তর-পূর্বে কুম্ভখোনামে পৌছে ৫৬ মাইল পথ অতিক্রম করে যান পদ্মকোট। সেখান থেকে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ত্রিপাত্রে/রামনাদ জেলার অন্তর্গত তিরুপাণ্ডুর পৌছে যান। ত্রিপাত্র হতে শ্রীরঙ্গম প্রায় ৫২ মাইল উত্তরে। গৌরাঙ্গদেবের সময় এই পথ পার্বত্য, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যময় ছিল কিনা জানা যায় না। তবে গোবিন্দদাস ৫০ যোজন বনের উল্লেখ করেছেন তাঁর করচায়। এই বনভূমি অতিক্রম করতে গৌরাঙ্গদেবের পনের দিন লেগেছিল।

তাই শ্রীরঙ্গম অনেক দূরে ছিল এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন গোবিন্দদাস। পুদুকোটাই নগরের উপকণ্ঠে পশ্চিমে তিরুগোকর্ণম নামে গোকর্ণেশ্বর শিবের প্রাচীন

মন্দির রয়েছে। সেখানে ভগবতী দেবীর নাম বৃহদম্বা। পুজ্জকোটাইয়ের রাজারা বৃহদম্বা দাস বলে খ্যাত। এই রাজ্যের মুদ্রার নাম অম্মানকাস্থ (Ammankasu —Terichinopoly Gazetteer P. 373) অর্থাৎ অম্মুমুদ্রা একটি ত্রিপাত্র ত্রিচিনোপল্লীর ১৬ মাইল উত্তরে রয়েছে। সেখানে শিব ও ভগবতীর মূর্তি আছে। গোবিন্দদাস বর্ণিত ত্রিপাত্র নাও হতে পারে। কারণ ত্রিপাত্র ও শ্রীরঙ্গমের মাঝখানে ৫০ যোজন গভীর বনের উল্লেখ রয়েছে। ত্রিপাত্রের ১৩ মাইল দক্ষিণে শ্রীরঙ্গম। মাদুরার বার মাইল উত্তর-পূর্বে তিরুবাদুর নগরের একটি প্রাচীন শিব মন্দির রয়েছে। গৌরাঙ্গদেব দক্ষিণ মথুরা বা মদুরা দর্শন করেছিলেন। তিরুবাদুর থেকে শ্রীরঙ্গমের দূরত্ব ৮০ মাইল উত্তরে।

শ্রীরঙ্গমে নৃসিংহদেব ও প্রহ্লাদ মূর্তি দর্শন করে মুগ্ধ হন গৌরাঙ্গদেব। শ্রীরঙ্গমে বিষ্ণু মূর্তি বিখ্যাত। সেখানে জম্বুকেশ্বর নামে শিব মূর্তি আছে। এই প্রসঙ্গে জলধর সেন লিখেছেন—শ্রীরঙ্গমে শিব মন্দির নেই তা ঠিক নয়। কিন্তু শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথই মুখ্য দেবতা। তাঁহার নাম অনুসারে শ্রীরঙ্গম হয়েছে। সেখানে রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রভাব এক সময় বেশী ছিল।”

শ্রীরঙ্গমকে একটি দ্বীপ বলা চলে। কারণ, কাবেরী নদীর জলধারা পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে শ্রীরঙ্গমকে ঘিরে রেখে জলধারা দুটি যুক্ত হয়ে আবার পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে।

ডঃ নাগরাজ শর্মা লিখেছেন—Rangadhama is the famous south Indian place of pilgrimage known as Sri Rangam. The Deity is Vishnu. The sacred name is Rangatha. The figure of Narasimha slaying Hiranyakasipn with Prahlad standing with folded hands in a coconut grove near the custom gate of the temple.

শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে গৌরাঙ্গদেব ঋষভ পর্বতে কৃষ্ণভক্ত পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঋষভ পর্বতকে এন.এল.দে বলেন—মাদুরার প্রায় ৫০ মাইল উত্তর পশ্চিমে পল্নী পাহাড়। বৈগাই (বৈহায়সী অথবা বেগবতী) নদী এই পর্বত থেকে উদ্ভূত হয়েছে। পল্নী পর্বতকে বরাহ পর্বতও বলে, ঋষভ পর্বত বলে না (Madura Gazetteer), কিন্তু পল্নী নগরের নয় মাইল পশ্চিমে ১৪২২ ফুট উচ্চতায় ঐবরমলয় পর্বত রয়েছে। সেখানে ষোলজন জৈন তীর্থঙ্করের প্রতিমূর্তি রয়েছে। ঋষভদেব জৈনদিগের আদি তীর্থঙ্কর অথবা আদিনাথ বলে খ্যাত।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের দ্বাবিংশতি অবতারের মধ্যে ঋষভদেব অষ্টম অবতার। এক সময় সম্ভবতঃ ঐবরমলয় জৈনগনের একটি প্রধান তীর্থ ছিল। তাই হয়তো ঐবরমলয়ের আর এক পরিচয় ঋষভ পর্বত। (Madura Gazetteer P. 300)

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মাদুরার বারো মাইল উত্তরে অলগড়মলয়কে ঋষভ পর্বত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই অঞ্চলে অলগড়মলয় নামে কোন পর্বত নেই। তবে মাদুরার বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে অলসরমলয় নামে একটি পর্বত রয়েছে। সেখানে অলগরস্বামী নামে বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। এই পর্বতকে ঋষভ পর্বত বলে মাদুরা গেজেটিয়ারে লেখা নেই। মাদুরার পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্বে হস্তী আকৃতি বিশিষ্ট ২৫০ ফুট উচ্চ দুই মাইল দীর্ঘ অনয়মলয় নামে পর্বত রয়েছে। তাকে সাধারণতঃ Elephant Hill বলা হয়। সেখানে জৈন তীর্থঙ্করদিগের প্রতিমূর্তির ভগ্নাবশেষ রয়েছে। এই পর্বত কি তবে ঋষভ পর্বত ?

ঋষভ পর্বত থেকে দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রের দিকে রামনাথ বা রামনাদে রামচন্দ্রের চরণচিহ্ন দেখে গৌরাঙ্গদেবের ভাবাবেশ হয়। রামনাদ রেলস্টেশনের সাত মাইল উত্তর-পূর্বে পক উপসাগর। তার উপকূলে দেবীপত্তম গ্রাম। রামেশ্বর যাবার পূর্বে এই স্থানে স্নান করে নবগ্রহ মূর্তি (সমুদ্রতট থেকে ২০০ হাত দূরে সমুদ্রের জলের মধ্যে সাতটি প্রস্তর স্তম্ভ) দর্শন করেন তীর্থযাত্রীরা। তার কাছেই সমুদ্র জলের ভেতরে শ্রীরামচন্দ্রের চরণচিহ্ন রয়েছে। রামনাদ স্টেশনের পাঁচ মাইল দক্ষিণে তিরু-প্পালানি নগর। কৃষ্ণদাস কবিরাজ একে দুর্বেশন বলে উল্লেখ করেছেন। দুর্বেশন— দর্ভশয়নের অপভ্রংশ। প্রবাদ, রামচন্দ্র দর্ভ বা কুশের ওপরে শয়ন করে ত্রিরাত্রি ব্রত সম্পন্ন করেছিলেন। তারপর সমুদ্রদেব তাঁকে বানর কটক সহ সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার জন্য সেতুবন্ধ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এখানে শেষশায়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। গৌরাঙ্গদেব দুর্বেশন দর্শন করবার পর আরো দক্ষিণ পূর্বে অগ্রসর হয়ে অনুরাগের সঙ্গে দর্শন করেছিলেন রামেশ্বর শিবকে। রামেশ্বর সেতুবন্ধে তিনি হরিনাম সঙ্কীর্তন করে তিনদিন অতিবাহিত করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে তত্ত্বকুণ্ডীতে পৌছে যান। সেখানে স্নান সমাপন করেন।

সম্ভবতঃ তুতিকোরিনের ৩০ মাইল উত্তরে তত্তনেরী নামে হ্রদ রয়েছে। সেই হ্রদের নাম তত্ত্বকুণ্ডী। তাম্রপর্ণীর উত্তরে তুতিকোরিনও হতে পারে। তামিল ভাষায় Tuticorin—তুতুক্কুডী বা তুতুর্কুডী বলা হয়। তুতুর্কুডী—যাহার জল গ্রীষ্ম-কালে শুষ্ক হয়। সেকালে অর্থবান লোকেরা ভাল পানীয় জল সংগ্রহ করতেন কলম্বো

থেকে। ওলন্দাজরা তুতুকুকুভিকে তিউতিকোরিন বলতো। ১৫৩২ সনে পর্তুগীজ এসেছিল তিউতিকোরিনে। গৌরাঙ্গদেব এসেছিলেন ১৫১১ সনে। তত্ত্বকুণ্ডী থেকে গৌরাঙ্গদেব পদব্রজে পৌছে যান তাম্রপর্ণী নদীতীরে। সেখানে এক পক্ষকাল অবস্থান করে মাঘী পূর্ণিমায় স্নান করেন নদীতে। তাম্রপর্ণী নদী তুতিকোরিনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। অগস্ত্য মলয়পর্বত থেকে উদ্ভূত হয়ে পাপনাসন তীর্থ, অম্বা সমুদ্র, তিন্নেবেল্লী নগরের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তাম্রপর্ণী নদী। পরে এই নদী পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে মান্নার উপসাগরে পতিত হয়েছে।

তাম্রপর্ণী নদী অতিক্রম করে গৌরাঙ্গদেব অবশেষে পৌছে যান ভারতবর্ষের শেষ দক্ষিণ প্রান্তে। কন্যাকুমারীতে এসে মুগ্ধ হয়ে যান গৌরাঙ্গদেব। গোবিন্দদাস বর্ণনা দিয়েছেন কন্যাকুমারীর

পর্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাঁই।
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবারে পাই॥
বড় বড় তরঙ্গ আসিয়া সেইখানে
ঈশ্বরের গুণগান করিছে সজ্ঞানে॥
পর্বত সমান বালি হয়ে স্তূপাকার।
ঈশ্বরের গুণ যেন করিছে বিস্তার॥
হু হু শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর।
কি কব অধিক কথা সেথা সকলি সুন্দর॥
দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন।
সেখানে সৌন্দর্য দেখে হয় শুদ্ধমন॥

কন্যাকুমারীতে স্নান করেন গৌরাঙ্গদেব। তাঁর হৃদয় ভগবৎ প্রেমে পরিপূর্ণ। হরিনাম কীর্তন করে ভাবাবেশে ক্রন্দন করেন। তারপর একদিন একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৌরাঙ্গদেব পঞ্চদশ ক্রোশ অতিক্রম করে পৌছে যান সাঁতাল পর্বতে। সেখান থেকে যান ত্রিবঙ্কু দেশে। গোবিন্দদাস লিখেছেন

ত্রিবঙ্কুদেশের রাজা বড় পুণ্যবান।
পালন করেন প্রজা পুত্রের সমান॥

ত্রিবঙ্ক দেশ সম্ভবতঃ বর্তমান ত্রিবান্দ্রাম নয়। কারণ, সেখানে অনন্ত পদ্মনাভ স্বামী বা শ্রীপদ্মনাভ স্বামীর মূর্তি গৌরাঙ্গদেব দর্শন করতেন। কবিরাজ গোস্বামী অনন্ত পদ্মনাভের উল্লেখ করেছেন। ত্রিবান্দ্রাম বা ত্রিবেন্দ্রমের নাম তিরু অনন্তপুরমের বা শ্রীঅনন্তপুরমের নাম। Archeological Deptt. of Travancore এ লেখা আছে। The present image of God Sri Padmanabhasvami at Trivandrum was installed after 1510 A.D., but the temple was in existence before. It is sacred to the Sri Vaishnavas and is referred to in their hymns. Out of the 108 temples sacred to the Vaishnavas 11 are in Travancore, of which Trivandrum temple is one. Travandrum was never named Trivanku.

গোবিন্দদাসের করচা অনুযায়ী গৌরাঙ্গদেব ত্রিবান্দ্রম আসেননি। কিন্তু ত্রিবঙ্ক দেশে প্রবেশ করেছিলেন। রামগিরি পর্বত কোচিনের প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে রামপুরমে অবস্থিত। এই পর্বতের উচ্চতা ৩১৬৬ ফুট। পর্বতশীর্ষে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ তিনদিন অতিবাহিত করেছিলেন লঙ্কাজয়ের পর।

ত্রিবঙ্ক পূর্বে কেরল বা চেরা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রিবঙ্কুরের সঙ্গে পরশুরামের নাম বিজড়িত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে আদি শঙ্করাচার্য কেরলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ষোড়শ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন, পরে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে বদরিকাশ্রমে দেহরক্ষা করেন। সেই সময় থেকে কেরলের নাম শ্রীবল্লমকোড বা তিরুবটমকোডে থেকে থিরুবরমকোড হয়েছিল। পরে স্থানটির ইংরাজী নাম হয়েছিল Trivancore। গোবিন্দ ত্রিবঙ্ক দেশের নগর স্থানে ত্রিবঙ্কনগর ব্যবহার করেছেন। গৌরাঙ্গদেবের ত্রিবাঙ্কুর আগমনের সময় সেখানকার রাজার নাম ছিল এরবি বর্মা (১৫০৪-১৫২৮ সন)। প্রচলিত প্রবাদ পাণ্ডবেরা বনবাসের সময় ত্রিবান্দ্রমে এসে পদ্মনাভ স্বামী দর্শন করেছিলেন। এই স্থানে ভগবতী মন্দির সংলগ্ন জলাশয়ের নাম ফল্গুননকুলম্ বা ফাল্গুনীর সরোবর। বর্তমান ত্রিবান্দ্রামের প্রায় ৪৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে শ্রীবর্ধনপুরম্ বা পদ্মনাভপুরম্ কেরল বা ত্রিবঙ্কুরের রাজধানী ছিল।

কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় গৌরাঙ্গদেব কন্যাকুমারী ও আমলকীতলাতে রামচন্দ্র দর্শনান্তে এসেছিলেন মল্লার দেশে। এই মল্লার দেশই ত্রিবঙ্কুর। মল্লার দেশে এসে গৌরাঙ্গদেব বাতাপানীতে রঘুনাথ দর্শন করেছিলেন। তারপর পয়স্বিনী তীরে

আদিকেশব, অনন্তপদ্মনাভে পদ্মনাভ ও শ্রীজনার্দন দর্শন করে পৌঁছে যান পয়োষ্ণী নগরে। অনন্তপদ্মনাভ ত্রিবান্দ্রমে অবস্থিত। শ্রীজনার্দন—ত্রিবাঙ্কুরের ভারকালায়। বাতাপানীর বর্তমান নাম ভূতপণ্ডী, কন্যাকুমারী থেকে ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সমস্ত স্থানটিই ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত।

পয়স্বিনী নদী সম্ভবতঃ পারালেয়ার নদীর সংস্কৃত নাম। এই নদীর তীরে রয়েছে আদিকেশবের মন্দির। গৌরাঙ্গদেব এই পবিত্র নদীতে স্নান করে মন্দির দর্শন করেন। তারপর পয়স্বিনী নদী অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছিলেন অনন্ত-পদ্মনাভে বা ত্রিবান্দ্রামে। সেখানে দুই দিন অতিবাহিত করবার পর পদযাত্রা করেন শ্রীজনার্দন। ত্রিবান্দ্রামের ২৬ মাইল দূরে সমুদ্রের আধ মাইলের মধ্যে জনার্দনস্বামীর মন্দির। সেখানে দুদিন অবস্থান করবার পর গৌরাঙ্গদেব যান পয়োষ্ণীতে। পয়োষ্ণীর শঙ্করনারায়ণ দর্শন লাভের পর উপস্থিত হন শঙ্করাচার্যের সিংহারি মঠ বা শৃঙ্গেরী মঠে।

গোবিন্দদাস তাঁর করচায় লিখেছেন যে—গৌরাঙ্গদেব ত্রিবঙ্কুনগরর সন্নিকটে রামগিরি পর্বতের ওপরে অগ্রসর হন। সেখানে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বিশ্রামস্থল দর্শন করে যান পয়োষ্ণী নগরে। সেখানে শিবনারায়ণ দর্শনান্তে শঙ্করাচার্যের শিঙারি মঠ বা শৃঙ্গেরী মঠে উপস্থিত হন।

পয়োষ্ণী নগর সম্ভবতঃ ত্রিবঙ্কুর ও মহিসুরের অন্তর্গত শৃঙ্গেরীর মাঝামাঝি কোথায়ও অবস্থিত। এন্. এল দে লিখেছেন—The river Purti in Travancore। ডঃ দীনেশ সেন লিখেছেন—পয়োষ্ণীর বর্তমান নাম পনোনী। পনোনী বা পোন্নানী নদীর সঙ্গে সমুদ্রের যোগাযোগ রয়েছে। সেখানে এডক্কোলমে বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির রয়েছে। পোন্নানীর ৩০ মাইল পূর্বে অবস্থিত ওট্টপলম নগর। সেখানে দেখতে পাওয়া যায় শিবনারায়ণের মূর্তি।

পয়স্বিনীর আর এক নাম চন্দ্রগিরি নদী। এই নদী যে স্থানে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে সেই সঙ্গম স্থলে গড়ে উঠেছে কাসরগড় নগর। সেখানে অনেক মন্দিরের মধ্যে বিখ্যাত মল্লিকার্জুন শিবের মন্দির।

শৃঙ্গেরী মঠ দর্শনের পর গৌরাঙ্গদেব উপস্থিত হয়েছিলেন মৎস্যতীর্থে। মৎস্য-তীর্থের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে এন.এল.দে লিখেছেন—মৎস্যতীর্থ মহিসুরের তুঙ্গভদ্রা নদীর সন্নিকটে তিরুপালন কুণ্ডমের ৮।১০ মাইল পশ্চিমে একটি পর্বত শীর্ষে অবস্থিত ক্ষুদ্র হ্রদ। সেই হ্রদ মৎস্যে পরিপূর্ণ। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এই স্থানকে মাহে নগরে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে মৎস্যতীর্থের সন্ধান পাওয়া

যায় না। গোবিন্দদাসের করচায় মৎস্যতীর্থের অবস্থান সম্পর্কে লিখেছেন যে মৎস্য-তীর্থ শৃঙ্গেরী ও ভদ্রার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। মহিষুরের কাতুর জেলায় শৃঙ্গেরী মঠের নিকটস্থ স্থানে অনেক দেবমন্দির সংলগ্ন জলাশয়ে মৎস্য সরোবরের উল্লেখ করেছেন রাইস্ সাহেব তাঁরই মাইশোর গ্রন্থে। মৎস্য তীর্থ দর্শনান্তে গৌরাঙ্গদেব কাচাড়ে ভগবতী দর্শন করে যান নাগপঞ্চপদীতে। সেখানে তিন রাত্রি অতি-বাহিত করবার পর যান চিতোলে। কাচাড় সম্ভবতঃ ভদ্রানদীর তীরে মহিষুরের কাতুর জেলায় অবস্থিত। ভদ্রা থেকে চিতোলের দূরত্ব ৮০ মাইল।

চিতোল ত্যাগ করবার পর গৌরাঙ্গদেব তুঙ্গভদ্রা নদীতে স্নান সম্পন্ন করেন। তারপর কাবেরী নদীর জন্মস্থান কোটিগিরিতে স্নান করেন। সেখান থেকে নীল রেখার মতো সত্যগিরি বামে রেখে চন্দ্রপুরে পৌঁছে যান। সত্যগিরি সম্ভবতঃ সত্যমঙ্গলম পর্বত। উত্কামন্দের প্রায় ১০ মাইল উত্তর-পূর্বে অপর একটি পর্বত শিখর কোটগিরি বা কোটিগিরি। কোটগিরির প্রায় ৮ মাইল উত্তর-পূর্বে কোদনাদ্-নগর। কোদনাদ্নগরের প্রায় ২২ মাইল পূর্বে সত্যমঙ্গলম পর্বত। নীলগিরির গেজেটিয়ারে দেখতে পাওয়া যায় : The views from this corner of the Nilgiri plateau across the Moyar (a tributary of the Bhavani) and away to the Satyamangalam Hills on the east are some of the finest of the plateau P. 332-33,

উতকামন্দের নিকটে কোটগিরি। কাবেরীর উপনদী ভবানীর জন্মস্থান এই কোটগিরি। কাবেরীর মূল ধারার সঙ্গে ভবানী মিলিত হয়েছে কৈম্বাটুর জেলার ভবানীনগরে। এল.এন.দে লিখেছেন—কুর্গের ব্রহ্মগিরির পর্বতের চন্দ্রতীর্থ নির্ঝরিণী হতে কাবেরী প্রধান শাখার উৎপত্তি হয়েছে।

চন্দ্রপুরে গৌরাঙ্গদেব ঈশ্বরভারতী নামে বৈদান্তিক যোগীর সঙ্গে বাধ্য হয়ে বেদ বেদান্ত বিচার শুরু করেন।

প্রভু বলে—বিচার না করিবারে জানি।
জানিলাম সর্বতত্ত্বে তুমি হও জ্ঞানী॥
বিচারে বড়ই তুমি পণ্ডিত গোঁসাই।
তোমার নিকটে হল পরাস্ত নিমাই॥
চাহ যদি জয় পত্র লিখে দিতে পারি।
তোমার বিচারে আজি মানিলাম হারি॥

তবু রেহাই পান না গৌরাঙ্গদেব। শাস্ত্র-বিচারে অবতীর্ণ করবার জন্য প্রলোভনকে পীড়া দেয়। গৌরাঙ্গদেব বলেন

বহু শাস্ত্র আলোচিয়া বল কিবা ফল।
কৃষ্ণ বিনা নাহি আছে দাঁড়াবার স্থল॥ গোঃ কঃ।

এই বলে গৌরাঙ্গদেব ভাবে বিভোর হন। নয়ন যুগল অশ্রুতে পরিপূর্ণ, স্ফুরিত অধর, সর্বাঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিকের লক্ষণ।

এই ভাব দেখি যোগী আপন নয়নে।
জড়াইয়া ধরে তার প্রভুর চরণে॥ গোঃ কঃ।

তার পর গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণ নাম বিতরণ করে গৌরাঙ্গদেব কাণ্ডার দেশে নীল-গিরিতে পৌছে যান। বিস্ময়কর সে দেশ। মুগ্ধ হন সৌন্দর্য দর্শনে। গোবিন্দদাস লিখেছেন

কাণ্ডার দেশে আছে শোভে নীলগিরি।
অপরাহ্নে সেইখানে যাই ধীরি ধীরি॥
কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরি রাজে।
ধ্যান মগ্ন যেন মহা পুরুষ বিরাজে॥
কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়।
আশ্চর্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়॥
বড় বড় বৃক্ষ তার শিরে আরোহিয়া।
চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া॥
ঝর ঝর শব্দে পড়ে ঝরণার জল।
তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল॥
পর্বতের নিয়ড়েরে ঘুরিয়া বেড়াই।
নবীন নবীন শোভা দেখিবারে পাই॥
কত শত লতা বৃক্ষে করিয়া বেষ্টন।
আদরেতে দেখাইছে দম্পতীবন্ধন॥

ময়ূরে বসিয়া ডালে কেকা রব করে।
নানা জাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে॥
নানাবিধ ফুল ফোটে করিয়াছে আলা।
প্রকৃতির গলে যেন ঝুলিতেছে মালা॥
রজনীতে কত লতা ঠগঠগি জ্বলে।
গাছে গাছে জোনাকী জ্বলিছে দলে দলে॥
ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে।
তার ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যা পূজা করে॥ গো: ক:।

মাল্লারের যেমন প্রচলিত নাম মালাবার তেমনি কাণ্ডারের নাম কানাড়া। পূর্বে নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চল কানাড়া প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। পরে এই অঞ্চল স্বতন্ত্র জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের প্রধান নগর উতকা-মন্দ।

The Nilgiri Hills properly Nila-Giri, the Blue Mountain, consist of the great plateau about 35 miles long, 20 broad and some 6500 feet high on an average upheaded at the junction of the ranges of the Eastern and Western ghats. The name Nilagiri which is at least 800 years old and was bestowed by the dwellers in the plains below the plateau was doubtless suggested by the blue haze which envelops the range in common with most distant hills of considerable size. Nilgiri Gazetteer, P. 1,

কাণ্ডার দেশ গৌরাঙ্গদেবকে মুগ্ধ করেছিলেন নিশ্চয়ই। এই পথে উড়িপি বা উড়ুপ বা উদিপী—গোবিন্দদাসের রচনায় তার উল্লেখ নেই। কাণ্ডার দেশ থেকে উত্তরে গুর্জরীনগর পৌঁছে যান। সেখানে অগস্ত্যকুণ্ডে স্নান করে বিজাপুর অগ্রসর হন। বিজাপুর পরিত্যাগ করবার পর গৌরাঙ্গদেব নীলগিরি-সহ্যগিরির অপূর্ব সৌন্দর্যে পুলকিত হন। সহ্যগিরির সৌন্দর্য গৌরাঙ্গদেবকে মলয়গিরির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

একবারে দেখ গেল সহ্যকুলাচল।
কুলাচল দেখি প্রভু আনন্দে বিহ্বল ॥
মহেন্দ্র মলয় গিরি দেখেছে নয়নে।
সহ্যগিরি শোভা আহা না যায় কথনে ॥
দূর হৈতে নীলবর্ণ রেখা দেখা যায়।
সেই স্থান দেখিবারে মোর প্রভু ধায় ॥

কাবেরী নদীর উত্তর অংশে অবস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। তারই অংশকে সহ্যগিরি বা সহ্যপর্বত বলে, দক্ষিণাংশকে মলয় পর্বত অথবা মহেন্দ্র মলয়গিরি বলা হয়। তিনেবেলী, ত্রিবঙ্কুরের মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলের পর্বত শ্রেণীকেও সহ্যগিরি বলে উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ। তারপর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে গৌরাঙ্গদেব ধূলিমাখা দেহ, জীর্ণ কৌপীন, দীন বেশ, মুখে অবিশ্রান্ত কৃষ্ণ নাম, নয়নে অশ্রু··· তিনি পৌঁছে যান পূর্ণনগর। যার বর্তমান নাম পুণা। পুণার পূর্বেই পাণ্ডুপুর। সেখানে শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা লেখা আছে চৈতন্যচরিতামৃতে। পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুরেই গৌরাঙ্গদেবের ভ্রাতৃ বিশ্বরূপ দেহ রক্ষা করেছিলেন।

গোবিন্দদাসের করচায় এই তথ্যের উল্লেখ করতে গিয়ে পাণ্ডুপুরের কথা নেই। এ সম্পর্কে অনুমান করা যায়···গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গী হিসাবে সমস্ত স্থানে ভ্রমণের সময় প্রভুকে নানা ভাবে সেবা করতে হয়েছে। দিনলিপি···নিয়মিত ভাবে রাখা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে। তবু অসংখ্য ভৌগোলিক তথ্যে পরিপূর্ণ করচা একটি সমৃদ্ধ রচনা।

গোবিন্দদাসের করচায় চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কথা বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দীর্ঘ পথের নিশানা, অসংখ্য ভৌগোলিক তথ্য সম্বলিত সুন্দর সহজবোধ্য ভ্রমণপঞ্জীকে অস্বীকার করা যায় না। আজ থেকে পাঁচশো বৎসর পূর্বের ভ্রমণকথা, সে যুগের পথঘাট স্থান, ভৌগোলিক পরিবেশ আজকের আলোকে বিচার করা যায় না। এই অতীত কালের পথ লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন চৈতন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে চলতে। লেখকের উচ্চশিক্ষার অভাব, বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা, আচার বিধির অজ্ঞতার জন্য হয়তো অনেক তথ্যই যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। তবু, এই দিনলিপি না রাখলে গৌরাঙ্গদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, সে প্রদেশে ভক্তিবাদ প্রচার হওয়া সম্ভব হত না। গোবিন্দদাস অবশ্য তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির অভাবের কথা স্বীকার করেছেন তাঁর করচায়।

সে সব আশ্চর্য লীলা পাই দেখিবারে।
করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে॥ গোঃ কঃ।

গোবিন্দদাস লিখেছেন নিজের অজ্ঞতার কথা, দুর্বলতার কথা।

না পারি লোকের বুলি সমস্ত বুঝিতে।
যাহা পারি তাহা লিখি আকারে ইঙ্গিতে॥
এই দেখে তীর্থ পলটিয়া দীর্ঘকাল।
সকলের বুলি বুঝে শচীর দুলাল॥
দুই চারি বাত প্রভু কভুরে পুছিয়া।
করচা করিয়া রাখি মনে বিচারিয়া॥
যেই লীলা দেখিলাম আপন নয়নে।
করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে॥
সদা উন্মত প্রভু কৃষ্ণ প্রেমাবেশে।
তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায় দেশে দেশে॥ গোঃ কঃ।

গোবিন্দদাসের করচায় গৌরাঙ্গদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের মধ্যে অনেক ভৌগোলিক তথ্য থাকায় করচাকে অত্যন্ত মূল্যবান দলিল হিসাবে মেনে নিতে হবে। অবশ্য করচা সম্পর্কে অনেক বিরূপ সমালোচনা রয়েছে। অনেক তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত গোবিন্দ-দাসের করচাকে অপ্রামাণিক বলে মনে করেন। তবে রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর গোবিন্দদাসের করচায় দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করে অপ্রামাণিক দোষ থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। সর্বোপরি তিনি বলেছেন···গোবিন্দদাসের করচা একটি মূল্যবান গ্রন্থ। গোবিন্দদাসের পর জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উল্লেখ রয়েছে। জয়ানন্দ সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র। চৈতন্যদেবের শিষ্যদের মধ্যে সুবুদ্ধি মিশ্রও একজন শিষ্য। জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের জীবনকালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই চৈতন্যদেব দর্শন, তাঁর লীলার কিছু হয়তো প্রত্যক্ষ করেছেন।

কিন্তু চৈতন্যদেবের তিরোধানের বহু বৎসর পর তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করে-ছিলেন। দীর্ঘকাল পরে স্মৃতিকে সম্বল করে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার মধ্যে তথ্যের ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। চৈতন্যমঙ্গলে লেখা আছে—জগন্নাথদেবের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ নির্দেশ পেয়েই গৌরাঙ্গদেব যাত্রা করেছিলেন দাক্ষিণাত্যে। নীলাচল

থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বেল্লরী জেলায় বিজয়-নগরে গিয়েছিলেন প্রথম। তারপর জিয়ড় নৃসিংহে যাত্রা করেছিলেন। নৃসিংহ দর্শন করে গৌরাঙ্গদেব গিয়েছিলেন পশ্চিমে নাসিক। নাসিক ত্যাগ করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পৌছেছিলেন কাবেরীতে। কাবেরী নদীতে স্নান সমাপন করে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন। উত্তরে ত্রিপদেত্রিমন দর্শন করে গিয়েছিলেন দক্ষিণে সেতুবন্ধে।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ভৌগোলিক তথ্য ত্রুটিপূর্ণ। পথের নিশানার মধ্যেও ধারাবাহিকতার অভাব। তিনি বার বার নীলাচল থেকে সেতুবন্ধে যাত্রার উল্লেখ করেছেন। বারবার উল্লেখ করেছেন কাঞ্চীতথের কথা। সেতুবন্ধে পৌছে লিখলেন—

মাহেন্দ্র ক্ষণ যাত্রা করি নীলাচল পরিহরি
উত্তরিলা মহা নৈ-পারো।
কাটাতি পাড়া বামে থুঞে বিজয়নগর দিয়ে
পূবে মিলায় পর্বত জিয়ড়ে।
গৌরাঙ্গ চলিলা সেতুবন্ধ।
যথা পুরী গোসাঞি আর রামানন্দ।

* * *

জিয়ড়ে নৃসিংহ দেখি তবে গেলা পঞ্চ নখী
গোদাবরী নদী পার হৈঞা।
পঞ্চবটী রম্যস্থান দেখি গৌর ভগবান
তেলেঙ্গা ব্রাহ্মণ ঘরে রৈঞা॥
কাবেরী নদীর জলে স্নান করি কুতূহলে
ত্রিমন নাথে বেঙ্কট পর্বতে।
গিরিকন্দর ঘোর ঝণ্ডকর প্রমদা নদী পার
সপ্তবারি অরণ্য পথে॥
বান রাজার দেশে প্রবেশিলা মহা ক্লেশে
সেতুবন্ধ দেখিলা সম্মুখে॥

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গৌরাঙ্গদেবের মথুরা বৃন্দাবন দর্শন, সেখান থেকে সেতু-বন্ধ। মাঝপথে শিবকাঞ্চী-বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শন করেন। সেতুবন্ধ থেকে গৌরাঙ্গদেব গিয়েছিলেন নীলাচলে। আবার নীলাচল ত্যাগ…পুনরায় পঞ্চবটী, গোদাবরী-নর্মদা

তীর্থ, সেখান থেকে পুনরায় সেতুবন্ধ দর্শন। সেতুবন্ধ দর্শনান্তে তুঙ্গভদ্রা, কাঞ্চী, আবার তুঙ্গভদ্রা। বিজয়নগর যাত্রা শেষ করেন নীলাচলে।

জয়ানন্দ লিখেছেন—

মথুরা দেখিয়া তবে গেলা সেতুবন্ধ॥
শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী মধ্যে মহারণ্য।
দ্রাবিড় ডাহিনে থুঞা চলিলা চৈতন্যে॥

শুভক্ষণে যাত্রা করি নীলাচল পরিহরি
পঞ্চবটী গোদাবরী পাশ।
পঞ্চতীর্থ মহা বাসুদেব সুপ্রকাশ॥
নর্মদা গৌতমী গঙ্গা তুঙ্গভদ্রা দেশ
তুলমন্দা গিরিবর্ণে করিল প্রবেশ।
কল্পঋষি মুখ দেখি সুরঙ্গ পইটন।
সেতুবন্ধ, কিষ্কিন্ধা, শতেক যোজন॥
শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী মাঝে মাঝে দিঞা
বিজয়নগরে প্রভু উত্তরিলে গিঞা॥

অবশেষে সমস্ত তীর্থ পর্যটন করে

মহানদী পার হঞা গেলা নীলাচলে।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ভৌগোলিক তথ্যে ত্রুটি, ধারাবাহিকতার অভাব। তবু দাক্ষিণাত্যে বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করেছেন গৌরাঙ্গদেব এই সত্যই পরিবেশিত হয়েছে চৈতন্যমঙ্গলে।

চৈতন্যচরিতাকার লোচনদাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেননি। চৈতন্যচরিতাকার চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমত। সে উদ্দেশ্য ভক্তিধর্ম প্রচার।

লেখকের অন্যান্য বই

গৌরাঙ্গলীলা প্রসঙ্গ	(দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ)
ঐ	(তৃতীয় খণ্ড মগজস্থ)
গঙ্গার কথা	(প্রথম পর্ব)
ঐ	(দ্বিতীয় পর্ব যন্ত্রস্থ)
হিমালয়ের দুর্ঘটনা	
হিমালয়ের ফুল	
রহস্যময় রূপকুণ্ড	
ঈশ্বরের উদ্যানে	
পথের তীর্থে	
সিকিম	